উদয়-পথের সহযাত্রী



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১এ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচিপত্র

উদয়-পথের সহযাত্রী

এবারের পত্রখানি একটু বড় করে লেখবার ইচ্ছা আছে—শেষ পর্যন্ত দেখি কতদূর হয়! সময় আমার এত কম যে আপাতত সব জায়গার সব বর্ণনা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য আমরা এখন জার্মানি পরিভ্রমণ করছি এ-খবরটা বোধহয় আগেই পেয়েছ। ভ্রমণকাহিনী লিখতে হলে আবার একটু প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করতে হয়। তা ছাড়া সোজা জিনিসটা কবিরা যেভাবে বাঁকা করে দেখে থাকেন, সে সূক্ষ্ম দৃষ্টিও আমার নাই। যদিও বা চেষ্টা করে কিছু লিখে ফেলি, তা হলে দেখি, এদিকে আমি অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি, দেশের কবিরা এগুলো এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে আমাদের জন্য আর কোনও ফাঁক রাখেন নাই। তবে আমার বর্ণনা ইউরোপে সকলের সুনজরে পড়বে না এটা ঠিক; কারণ, 'ভারতবর্ষ' আমার চোখে আরও সুন্দর লাগে—আর এদেশের বিখ্যাত জায়গার দৃশ্য আমার কাছে ভারতের দৃশ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না—তুলনা করতে গেলেই মনে হয় অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা—"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ।" এ আমার অত্যুক্তি নয়, নিছক সত্য। ভারতের বাইরে না এলে ভারতকে বোঝা যায় না—

আমরা এবারে খুব বড় সফরে ঘুরছি। জার্মানির প্রায় সমস্ত প্রধান ও অপ্রধান শহরে আমাদের শো দিতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা Holland ও Belgium ঘুরে এসেছি। Holland-এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। প্রথমত এরা কিছুতেই

আমাদের হল্যান্ডে ঢুকতে দিল না; তাদের কী রকম ধারণা হল, এত যন্ত্র এবং কাপড় কখনও আর্টিস্টদের সঙ্গে যেতে পারে না—এরা নিশ্চয় ব্যবসাদার। তারা এই সমস্ত যন্ত্রের দাম চেয়ে বসল এবং অনুকম্পা একটু দেখাল যে, যন্ত্র এবং বস্ত্রের দামগুলি রেখে যান—ফিরে যাবার সময়—যদি বিক্রয় না করি—তবে দাম ফেরত দেওয়া যাবে। অনেক তর্ক-বিতর্কে কোনও ফল হল না দেখে বাক্স খুলে আমার "স্বরদ" বের করে বাজাতে আরম্ভ করলুম (ভেবে দেখ স্থান, কাল এবং পাত্রের কথা)। যাই হোক, বোধহয় এই অভিনব যন্ত্র,—তার আওয়াজে এই কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোকটি খুশিই হলেন; যেহেতু খানিক বাজাবার পর তাঁর রুদ্র মূর্তি প্রশান্ত হল এবং আমরাও নিষ্কৃতি পেলুম। এই সব করতে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি আটটা বেজে গিয়েছিল, তখনও Amsterdam-এর দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার (প্রায় ৬৫ মাইল)।

এই দেশটা কৃপণতার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। বড় বড় নদী বা Canal পার হবার জন্য পোল নাই। বড় বড় স্টিমারে গাড়ি বা মোটর পার হয়, অবশ্য পয়সা দিয়ে ছোট ছোট পোল যাও বা দু'-একটা আছে, তা পার হতেও পয়সা দিতে হয়। যাই হোক, আমরা রাত্রি এগারোটায় 'আমস্টার্ডাম'-এ এসে পৌঁছুলাম। এখানে আর এক বিপদ। যতগুলি হোটেল সব আলো নিভানো, অথচ সেগুলি খোলা আছে। শুধু শুধু এরা আলো জ্বেলে পয়সা নষ্ট করতে চায় না। দরদস্তুর হবার পর আমরা যেমন বাক্সগুলি নামিয়েছি, আর একজন লোক এসে খবর দিলেন,—ম্যানেজার তাঁর মত বদলেছেন—আরও কিছু দক্ষিণা না দিলে হোটেলে থাকতে দেওয়া হবে না। আমরা ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য যেমন তার ঘরে ঢুকব—সঙ্গে সঙ্গে আলোও নিভে গেল; অন্ধকারে হাতড়ে তাকে বের করা অসম্ভব ভেবে অন্য হোটেলে আস্তানা নেওয়া গেল। এখানকার আসরে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। পরে Hague, Antwerp,

Brussels ও Leige-এ আমাদের শো দেওয়া হয়েছিল। শেষের তিনটি শহর Belgium-এ। এ সমস্ত বিবরণ পরে জানাব। জার্মানিতে আজ পর্যন্ত যতগুলি শহরে গিয়াছি, সে সমস্ত স্থানে জনসাধারণ আমাদের যে কীভাবে অভ্যর্থনা ও সমাদর করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—এবং তোমরা ভাবতেও পারবে না। অবশ্য প্যারিসের খবর তো জানই। Spain-এ একরকম হয়েছে। Switzerland-এর জেনেভা ও জুরিচের কথা চিরকাল মনে থাকবে। কিন্তু জার্মানিতে আমরা যে আদর পাচ্ছি তার তুলনা নাই। এবং আমরা এখানে সময় সময় অতি আদরে ও অভ্যর্থনায় সত্যই লজ্জিত হয়ে পড়ছি। ইতিমধ্যে আমরা Berlin, Permasens, Wiesbaden, Manheim, Gieben, Gelsenkirchen, Rhein, Dusselsorf, Freiburg, Kolu, Lihehmgal, Saal, Heidelburg, Dillingen, Saarbrucken, Munich, Hamburg, Leipzig, Baden-Baden, Karlsruhe, Heilbrown, Pforzhcim, Cologne, Charlottenburg, Settin, Meinihgen, Chemnitz, Dresden, Halle, Hallerstadt, Hanover, Frankfurt, Dusseldorf, Giebon, Gricfswald, Rostock, Selwerin, Kiel, Flensburg, Breman প্রভৃতি স্থানে শো দিয়াছি। এখানকার আরও প্রায় পঁচিশটি শহরে এক মাসের মধ্যে যেতে হবে। পূর্বোক্ত প্রত্যেক স্থানেই আমাদের শোতে ফুল হাউস তো হয়েই ছিল; তা ছাড়া কত লোক যে ফিরে গিয়েছে তার ঠিকানা নাই। আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোথাও এক দিন বা দু' দিনের বেশি থাকবার উপায় ছিল না—তবে প্রত্যেক জায়গায় পুনরায় আসবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। এদের আতিথ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা যেখানেই গিয়েছি, রাস্তায় বেরুলেই পাঁচ-ছয় শত লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছে এবং আমাদের সামান্য উপকারের বা সাহায্যের জন্য যেন এরা লালায়িত। Hamburg-এ যখন আমরা শো দিই, শেষ হয়ে যাবার পর প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে দর্শকরা হাততালি ও

আনন্দধ্বনি করেছিলেন। তারপরে আমাদের জিনিসপত্র প্যাক করে রঙ্গালয় থেকে বেরুতে অনেক দেরি হয়েছিল—বাইরে প্রায় সমস্ত লোকই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখেই সকলে হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিতে আরম্ভ করলেন—আমরা সেদিন সত্যই ভারী লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, অত রাত্রে ওই শীতে ওখানকার সমস্ত বড় বড় মনীষী, ধনকুবের এবং মহিলারাও ওইভাবে অপেক্ষা করছিলেন দেখে। একটা কথা—ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশের মতো জার্মানিতে সকলেই শোর পরে ড্রেসিং রুমে আসেন না—যাঁরা অত্যন্ত পরিচিত শুধু তাঁরাই ভেতরে এসে দেখা করেন—বাকি সকলেই বাইরে অপেক্ষা করেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি সেখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। Manheim-এর 'জাতীয় রঙ্গালয়ে'-ও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছিল। এই 'জাতীয় রঙ্গালয়ে' অমর নাট্যকার Schiller-এর অপূর্ব নাটকগুলির প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এখানেও Paris-এর Champs-Ellyssees-এর মতো শুধু উচ্চশ্রেণীর আর্ট ছাড়া কিছুই প্রদর্শিত হয় না। Lihenmgal Saal-এ দর্শকের সংখ্যা ছিল ৩৫০০। শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্করের শিব তাণ্ডব দেখে এরা প্রায় পাগল হয়ে গেছে—সে-স্মৃতির আনন্দ অনির্বচনীয়। আর এক দিনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৪ই জানুয়ারি সকাল আটটার সময় Stuttgurt থেকে রওনা হলুম Meiningen-এ যাবার জন্য। একটা কথা লিখতে ভুল হয়েছে। আমরা এই যে জার্মানি পরিভ্রমণ করছি, তাহা ট্রেনে নয় একটি Auto-Bus-এ। শুধু এক বার Hamburg-এ Hanging train-এ উঠেছিলুম—সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। যদি কখনও চড়বার সুযোগ হয় তা হলেই বুঝতে পারবে। যাক—সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল। আমাদের ৩৬৭ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ২৩০ মাইল যেতে হবে। সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল—আমাদের Auto-Bus ধীরে ধীরে চলছিল; কারণ,

রাস্তাটা বড় পিছল হয়ে ছিল,—তা ছাড়া রাস্তাটা পাহাড়ের উপর দিয়ে। বেলা একটা পর্যন্ত আমরা বেশ নির্বিঘ্নে এলুম। এক জায়গায় তিন-চার জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের বেশি অগ্রসর হতে বারণ করলে; কারণ, কিছু দূরে একটা পোল আছে—সেটার উপর দিয়ে চার টনের উপর ভার নিয়ে যাওয়া যায় না। আমরা তাদের কথা বিশ্বাস না করে এগিয়ে গেলুম—আমাদের Auto-Busটার ওজন ন' টন। খানিক এগিয়ে পোল পাওয়া গেল। আমাদের সোফার সেটা পার হতে রাজি হলেন না—জিজ্ঞাসা করায় বললেন ব্রিজটা পার হতে পারি—তবে চার টন পার হবে আর বাকি পাঁচ টন পড়ে থাকবে। আরও মুশকিল অত বড় বাস ঘোরাবার জায়গা নাই; আর তেলও ফুরিয়ে এসেছে। অনেক ভেবে নিরুপায় হয়ে সেটাকে পেছু হটাতে আরম্ভ করা গেল। আধ মাইল এইভাবে আসার পর ঘোরাবার জায়গা পাওয়া গেল। তখন আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে যাত্রা শুরু করলুম। বেলা পাঁচটায় আমরা Rotteubarg গ্রামে এসে হাজির হলুম। এই গ্রামটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং ইহা নাকি জার্মানির একটি অতি পুরাতন গ্রাম। সমস্ত দিন উপবাসের পর এখানে এসে পেটে কিছু পড়ল। তখন আবার রওনা হলুম। এখানকার পাহাড়ের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। যদিও তখন ছ'টা বেজেছে, তবু রাত্রি হয়ে গেছে। একেই বৃষ্টিতে পিছল, তার উপর ঘন কুয়াশা। এ ধরনের ঘন কুয়াশা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। সামনে থেকে যে দু'-একটা মোটর আসছে, আলো দেখে মনে হয় এক মাইল দূরে আছে, কিন্তু বাস্তবিক সেটার দূরত্ব মাত্র দশ হাত। আমাদের Bus-এর তীব্র হেড লাইটে তিন-চার হাত দূরের বেশি কিছুই দেখা যায় না। আমাদের সোফার গাড়ি দাঁড় করিয়ে লাইটের উপর হলদে রঙের কাচ পরিয়ে দিল, তাতে নাকি কুয়াশা ভেদ করে কিছু কিছু দেখা যায়। আমরা কিন্তু বিশেষ তফাত বোধ করলুম না। শুধু এতক্ষণ আমরা সাদা কুয়াশা (ধোঁয়া) দেখছিলুম—এইবার

সেগুলো হলদে হয়ে গেল (কতকটা সরষে ফুলের মতো!))। আমরা যতই পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলুম—ততই কুয়াশা ঘন হতে লাগল। আমরা সামনে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, শুধু পাশে দেখতে পারছিলুম যে, আমরা রাস্তার উপর দিয়ে চলেছি, রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত এইভাবে চলবার পর আমাদের বাসটা পিছলে এক ধারে গিয়ে পড়ল—সোফার অনেক চেষ্টাতেও থামাতে পারল না। পাশে একটা খানার মতো ছিল—এক দিকের দুটো চাকাই তার মধ্যে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাসটাও কাত হয়ে পড়ল। একেবারে উলটে যায় নাই এই ভাগ্য। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। সোফার আর এক বার চেষ্টা করল গাড়িকে তুলতে। ফলে কাদার মধ্যে চাকাগুলো আরও এক ফুট বসে গেল। তখন নিরুপায়। বাইরে কনকনে ঠান্ডা, তার উপর তুষারপাত; সারা রাত্রি এভাবে থাকলে তুষার-সমাধি নিশ্চিত। ইতিমধ্যে দূরে একটা মোটরের আলো দেখা গেল। আমাদের সেক্রেটারি Mr. Lasto Bogner তাদের হাত নেড়ে থামিয়ে জার্মান ভাষাতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে; সেখান থেকে সাহায্য নিতে হবে। এই বলে Mr. Bonger-কে সঙ্গে করে তাঁরা নিয়ে গেলেন। আমাদের ব্যবস্থা হল, যতক্ষণ না সাহায্য আসে আমরা শীতে কাঁপব। আমাদের সেক্রেটারি Mr. L. Bogner একজন হাঙ্গেরিয়ান (Hungarian) ভদ্রলোক। এঁর একটি বিশেষত্ব—কোনও বিপদে না পড়লে ইনি বড় বিমর্ষ থাকেন যেন;—বিপদে পড়তে পারলেই বাঁচেন—কাজেই এই ব্যাপারে তাঁর যে বিশেষ আনন্দ হয়েছিল সে-কথা বলা বাহুল্য। কিছুক্ষণ পরে একটা মোটর সাইকেল ভীষণ বেগে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু খানিকটা গিয়ে সেটা আবার ফিরে এল। তাতে দু'জন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা আমাদের ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করলেন। সেটা আমরা ভাবে বুঝলুম—ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। আমরাও 'মুদ্রা' অভিনয়

দ্বারা তাঁদের সব বুঝিয়ে দিলুম। তাঁরা বুঝতে পেরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন। এটা জার্মানদের মজ্জাগত স্বভাব—ইউরোপের অন্য কোনও জাতি এ অবস্থায় সাহায্য করতে রাজি হত না। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে বুঝিয়ে দিলুম যে, আমাদের লোক নিকটবর্তী গ্রামে গিয়েছে এবং আমাদের দু'জনের দ্বারা এ-কাজটা মোটেই সম্ভব নয়। অগত্যা তাঁহারা ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলেন—আমরাও শীতে কাঁপতে লাগলাম। আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল যে Bogner যখন গিয়েছে, সে একটা না একটা ব্যবস্থা করবেই। আমরা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা গেল যে, সেই দু'জন লোক মোটর সাইকেলে আবার ফিরে এসেছেন। তাঁরা জানালেন, কাছেই একটি ছোট গ্রাম আছে এবং সেখানে একটি ছোট হোটেল আছে। খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই; তবে শোবার জায়গা হতে পারে। তা ছাড়া এই রাত্রে এ রকম কুয়াশাতে কেউ সাহায্য করতে আসবে না। আমরা কিন্তু যেতে রাজি হতে পারলুম না নানা কারণে। তা ছাড়া এই সব জিনিসপত্র অজানা জায়গায় ফেলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাই হোক লোক দুটি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলেন। এইভাবে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। কিছু পরেই Bogner একটা ট্রাক্টর ও কয়েকজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে এল। অত রাত্রে এদের আনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় তৎক্ষণাৎ আর একটি ওই রকমের ট্রাক্টর এবং কয়েকজন লোক এসে হাজির হল। এদের জোগাড় করে নিয়ে এলেন সেই দু'জন লোক যারা মোটর সাইকেল করে এসেছিলেন। যাই হোক তারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করল। বাসে মোটা শিকল বেঁধে ট্র্যাক্টর দিয়ে টানাটানি আরম্ভ করল। আমরাও সকলে মিলে বাসটাকে ঠেলে রেখেছিলুম যাতে না উলটে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেটা রাস্তার উপর উঠে এল। আমরাও উদ্ধার পেলুম। এ যাত্রা আমাদের এত সহজে উদ্ধার পাবার

প্রধান কারণ যে এ দেশটা জার্মানি। অন্য কোনও দেশের লোক এত রাত্রে বিদেশি লোককে সাহায্য করবার জন্য আসত না। পরোপকার-বৃত্তি এই জার্মান জাতির একরকম মজ্জাগত। যাই হোক, আমরা সকলকে যথেষ্ট ধন্যবাদ ও বকশিস দিয়ে রওনা হয়ে পড়লুম। রাত্রি একটার সময় নিকটস্থ একটি ছোট গ্রামে এসে পৌঁছুলাম। সেখানে কিছু খাবার জোগাড় হল অনেক কষ্টে। অত রাত্রেও আমাদের চারিপাশে ভিড় জমে গেল। আমরা যে কোন দেশের লোক তা তারা বেশ বুঝতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে একজন Auto Bus-এর কাচের উপর যে কুয়াশার জলীয় পর্দা জমেছিল, তাতে আঙুল দিয়ে লিখে দিল 'Gandhi Bravo'। যাই হোক, আমরা রওনা হয়ে অতি কষ্টে সেই পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে রাত্রি চারটের সময় এসে পৌঁছলাম। সে-রাত্রে ওই পিছল পাহাড় থেকে যে কোথাও গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন বা লোপ পেয়ে যাই নাই এই যথেষ্ট।

২৪শে জানুয়ারি আমরা বার্লিনে পৌঁছুলুম—তার পরের দিনই Stettin-এ আমাদের শো ছিল। আমরা Chemnitz-এ যে শো দিয়েছিলাম সেটা সকাল দশটায় আরম্ভ হয়েছিল। সেই অসময়েও অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। সেইদিন সন্ধ্যাতেই Leipzig-এ আর একটি শো দিতে হয়েছিল। এখানে নানা দেশের স্টেজ, সাজঘর, আলোর ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখতে গেলে অনেক কথাই লিখতে হয়। প্রত্যেক জায়গায়ই নূতন নূতন ব্যবস্থা দেখতে পাই। এই সমস্ত আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আলোর বন্দোবস্ত, স্টেজ ঘোরাবার বন্দোবস্ত, এ সমস্ত সত্যই দেখবার মতো। আমরা এখানে জার্মান বায়স্কোপ ও থিয়েটার দেখলাম। এদের বায়স্কোপে আখ্যানভাগ ফ্রান্সের মতো একেবারে বাজে, কিন্তু ফটোগ্রাফি ও টেকনিক এত উচ্চ ধরনের যে মনে হয় আমেরিকার ফটোগ্রাফি এর কাছে তুচ্ছ।

জার্মানির কয়েক জায়গায় Anti-French feeling অত্যন্ত

বেশি। সেই জন্য আমাদের প্রধান ভয় ছিল যে, আমাদের মোটর-চালক একজন ফরাসি এবং আমাদের নিজেদের যে মোটর বাস সেটিও ফরাসি দেশে প্রস্তুত—Made in France! গাড়ির মেকার ছিল প্রসিদ্ধ 'Renault'। অতএব হয়তো জার্মানিতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে। কিন্তু সুখের বিষয় যে দু'-একটা সামান্য ঘটনা ছাড়া এজন্য আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি। এক বার Grunburg-এর হোটেলের ম্যানেজার আমাদের ফরাসি বাস ও বাস-চালককে কিছুতেই তাদের গ্যারাজে স্থান দিতে চায়নি। অতি কষ্টে দ্বিগুণ ভাড়া দণ্ড দিয়ে তবে এক রাত্রির জন্য রাখবার উপায় হল!

২০শে জানুয়ারি আমরা Hallo-এ ইউরোপের শত সংখ্যক শো দিলাম। (গত বৎসর 3rd March 1931-এ Paris-এ প্রথম আমরা অবতীর্ণ হই—এ-কথা বোধহয় মনে আছে।) সেদিন আমরা এখানে ডিনারে এখানকার বড় বড় লোক এবং ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সে-রাত্রি খুব আমোদে কেটেছে।

১৯ তারিখে Dresden-এ Concert Hall-এ আমরা শো দিয়েছিলাম। এখানে সবসুদ্ধ দেড় হাজার লোকের বসবার আসন ছিল; লোক হয়েছিল দু' হাজারেরও উপর—বাকি সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে Mary Wigman-এর বিখ্যাত নাচের স্কুল আছে। এখানে একজন ভারতীয় মহিলাকেও (মুসলমান) দেখিলাম। তিনি দিল্লি হইতে এখানে নৃত্য শিখতে আসিয়াছেন। এখানে সাধারণত আমেরিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য শিখতে আসেন, কারণ টেকনিকের দিক দিয়ে এত ভাল নাচের স্কুল নাকি ইউরোপে আর নাই। এখানে যতগুলি জায়গায় আমাদের শো দেওয়া হয়েছে, প্রায় সর্বত্রই পুনরায় আসতে হবে এই রকম কথা দিতে হয়েছে। এরা আমাদের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে চায়, কিন্তু 'মার্ক'-এর দাম যদি হঠাৎ নেমে যায় (এর সম্ভাবনা খুব বেশি), তা হলে আমাদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি যেখানে

যেখানে শো দেবার কথা আগে থেকে ছিল, সেইগুলি শেষ করে প্যারীতে ফিরে যাব।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা লেখবার আছে। গত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' ডা. শ্রীযুক্ত রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের 'প্যারিসে কয় রাত্রি' পড়লাম। তিনি তাতে আমাদের নামেরও উল্লেখ করেছেন দেখলাম। এঁর প্রবন্ধ পড়ে প্যারির লোকেরা, আমরা যেভাবে মিস মেয়োকে দোষ দিই, সেইভাবেই দোষ দিবেন। তিনি এখানকার খারাপ জিনিসগুলির বর্ণনাই বেশি করেছেন; কিন্তু এর ভাল জিনিসগুলি এত ভাল যা অন্য কোনও সভ্য দেশে পাওয়া দুষ্কর। তবে তাঁকেও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। এখানে যাঁরা নূতন আসেন Thos. Cook তাঁদের Paris by night দেখাবার ভার নেয়, অবশ্য উপযুক্ত দক্ষিণা নিয়ে; এবং তারা যা দেখায় তা তো ভদ্রলোক বর্ণনা করেছেন। আমি এখানকার অনেক লোককে জানি যাঁরা জীবনে 'ক্যাজিনো দি প্যারি' বা ফলি বার্জা প্রভৃতি উল্লিখিত স্থানে জীবনে যান নাই। এই সমস্ত স্থানে বিদেশির ভিড়ই বেশি হয় এবং তাদের অর্থেই এগুলি পরিপুষ্ট।

আমরা এত জায়গায় যাচ্ছি—সমস্ত দেশের বড় বড় লোকের ও বড় বড় সাময়িক পত্রে আমাদের যে সমস্ত সুখ্যাতি বেরুচ্ছে—সত্য কথা বলতে গেলে সেগুলি আমাদের প্রাপ্য নয়। তারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের হিন্দু সভ্যতা, তার সংগীত ও নৃত্যের নমুনাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, আর প্রত্যেকেই বলে হিন্দু সভ্যতা বা 'কালচার' যে কত উচ্চ স্তরে গিয়েছিল, তা আমরা ধারণা করতেই পারব না। আমাদের দেশ ও সভ্যতার প্রতি তাদের এ ধরনের ভক্তি ও উচ্ছ্বাস আমাদের মনে যে কী আনন্দ আনে তা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের. নিন্দা, সুখ্যাতি, লাভ বা ক্ষতির কথা আমাদের মনেই আসে না। তা ছাড়া আর একটা কথা—এখানে সমস্ত দেশের বড় বড় সংগীতজ্ঞগণের সঙ্গে আলাপ করবার এবং তাঁদের গান বা বাজনা শোনবার এবং তাঁদের সঙ্গে

সংগীত-আলোচনা করবার সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সংগীতের 'আলাপ' সম্বন্ধে আলোচনায় যখন এঁদের বুঝিয়ে দিই যে, আমাদের রাগের আলাপের কোনও সীমা নেই এবং এখানে শুধু গায়ক বা বাদকের ভাব অনুযায়ী সেটা যত ইচ্ছা বাড়ানো যেতে পারে এবং সংগীতের রস-সৃষ্টি শুধু গায়ক বা বাদকের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে—ইওরোপের মতো সংগীত-রচয়িতার (composer) স্থান ভারতীয় সংগীতে নাই, ইত্যাদি এঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন এবং সকলেই বলেন স্মরণাতীত কাল থেকে এ সংগীত আপনাদের মধ্যে চলে আসছে—আমরা ধারণা করতেই পারি না সভ্যতা কোন স্তরে উঠলে এ ধরনের সংগীত সৃষ্ট হতে পারে!! কেউ কেউ বলেন—আমরা এখন বিশ্বাস করছি আপনাদের সংগীত মনুষ্য-সৃষ্ট নয়, দেব-সৃষ্ট। আমাদের দেশের সংগীত সম্বন্ধে এখানে বড় বড় সংগীতজ্ঞের এ ধরনের উচ্ছ্বাস—আমাদের যে কোথায় নিয়ে যায়—তা তোমরা ভাবতেই পারবে না। এই তো গেল সংগীতের কথা। হিন্দু-নৃত্য সম্বন্ধে ওদের যা ধারণা শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর করিয়ে দিয়েছেন, তা তোমরা ধারণা করতে পারবে না। যেখানেই আমাদের শো হয়েছে, প্রত্যেক স্থানেই কুড়ি-পঁচিশ বার করে Encore হয়েছে এবং এক-একটা নৃত্য দু'-তিন বার দেখাবার পর তাঁর শরীরের অবস্থা যা হয় বুঝতেই পারছ। কাজেই অধিকাংশ সময়েই দর্শকবৃন্দের উল্লাসধ্বনি এবং Encore উপেক্ষা করেই চলে আসতে হয়। তা ছাড়া এ দেশের সমস্ত ছোট-বড় সাময়িক পত্র এবং গুণগ্রাহী মনীষীরা উদয়শঙ্করকে যেভাবে স্তুতি করেছে, তা দেবতারই যোগ্য। আমাদের প্রধান গর্ব আমরা উদয়শঙ্করের সঙ্গী এবং তার এই পাশ্চাত্য প্রদেশাভিযানের সহযাত্রী! এবং আরও বড় গর্ব যে প্রাচীন হিন্দু-নৃত্যকলার যিনি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং বিশ্বের দরবারে তাকে মহনীয় করে তুলেছেন, তিনি আমাদেরই একজন বাঙালি।

আমাদের আপাতত এপ্রিল মাস পর্যন্ত এইভাবে ঘুরতে হবে। দক্ষিণ ইউরোপের প্রায় পঞ্চাশটি শহরে আমাদের শো শেষ করে যদি জীবিত অবস্থায় প্যারিসে ফিরতে পারি আবার বড় করে চিঠি লিখব।

Hotel Excelsior
Bremer haven
(Germany)

২

গতবারেই জানিয়েছি যে জার্মানির প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত শহরগুলিতে আমাদের 'নৃত্যাভিনয়' হয়েছে। পরে অস্ট্রিয়া এবং ইটালি হয়ে আবার বার্লিনে সাত দিন 'নৃত্যাভিনয়' দেখিয়ে পুনরায় আমরা প্যারিতে এসেছি। এখানে 'সাঁজলিজে' (Champs Elysses) রঙ্গমঞ্চে কয়েকদিন 'নৃত্যাভিনয়' দেখিয়ে আমরা এবার রওনা হচ্ছি ডেনমার্ক, বেলজিয়ম্, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, (স্ক্যান্ডিনেভিয়া), ল্যাটভিয়া, এসথোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লেনিনগ্রাড (রাশিয়া) এবং ওয়ারশ (পোল্যান্ড)। এ-সব দেশ ঘুরে আবার আমাদের জার্মানিতে যেতে হবে। গত নভেম্বর মাসে প্যারি থেকে যাত্রা শুরু করে সমগ্র জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারি, লাক্সেমবার্গ, রুমেনিয়া, ইটালি, সুইজারল্যান্ড হয়ে গত মে মাসে অর্থাৎ পুরো সাত মাস দক্ষিণ ইউরোপ ঘোরবার পর আবার আমরা প্যারিতে এসে পৌঁছেছি। অভিজ্ঞতা হিসেবে যে কিছুই লাভ হয়নি তা নয়, বরঞ্চ, নিছক পরিব্রাজক হিসাবে এত দেশ ভ্রমণ করলে একটুও হত কি না বলা যায় না। প্রথমত হয়তো যে সমস্ত বড় বড় পণ্ডিত, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী এবং সংগীতজ্ঞ মনীষিগণের সঙ্গে আলাপ ও

আলোচনা করবার সৌভাগ্য হয়েছে, সেটা পরিব্রাজক হিসাবে গেলে হত কি না সন্দেহ। তবুও আমরা অনেকের সঙ্গে দেখা বা আলাপ করবার অবকাশ সব সময় পাই না। তার কারণ, যে যে দেশে যে যে তারিখে আমাদের 'নৃত্যাভিনয়' হবে তার এক দিন কিংবা দু' দিন আগেও সেখানে পৌঁছুবার সুবিধা আমাদের হয় না। হয়তো সেইদিন সকালেই কিংবা দুপুরে সেখানে হাজির হলুম। সারা রাত হয়তো ট্রেনেই কাটাতে হয়েছে। কাজেই, সেখানে পৌঁছেই আর তৎক্ষণাৎ বেড়াতে বেরুবার মতো শরীরের অবস্থা বা উৎসাহ কোনওটাই থাকে না। যে দেশেই যাই না কেন, সেখানে পৌঁছেই আমাদের প্রথম কাজ মনের মতো একটি হোটেল খুঁজে নেওয়া; তারপর, স্নানাহার শেষ করে আমাদের খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রাস্তায় বেরুতে হয়। একেই তো ইউরোপের প্রায় সকলের ধারণা যে আমরা একটা পরাধীন জাতি সুতরাং অসভ্য। তার উপর চেহারায় ও পোশাক-পরিচ্ছদে যদি কোনও রকম ত্রুটি বা দৈন্য প্রকাশ পায় তা হলেই মুশকিল। যাক, এদিক দিয়ে আমরা যে উতরে গেছি তা আমাদের ছবি দেখে ও আদর-অভ্যর্থনার ব্যাপার কাগজে পড়ে আশা করি দেশের লোকে বিশ্বাস করতে পারবে। থিয়েটারে অন্তত আমাদের দু'-তিন ঘণ্টা আগে পৌঁছুনো দরকার, কারণ আমাদের ভারতীয় যন্ত্রগুলি এরকম খেয়ালি যে, এটা বাঁধতে ওটা নেমে যায়, আবার ওটা বাঁধি তো এটা চড়ে যায়। তার উপর এদেশে থিয়েটারের প্রেক্ষাগার ও রঙ্গমঞ্চ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরম করে তোলা হয়, তার ফলে চামড়ার যন্ত্রগুলি চটে উঠে ক্রমেই চড়তে থাকে। এই জন্য আমাদের কাজ আরও বেড়ে যায়। তাদের ঠান্ডা না করে তো আর ছোঁবার উপায় নেই। আমাদের অভিনয় সাধারণত শুরু হয় সন্ধ্যা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। শেষ হতে পুরো আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। তারপর অভিনয়ান্তে সমস্ত যন্ত্রপাতি আমাদের নিজের হাতে সাবধানে প্যাক করতে হয়। আমাদের যন্ত্রসমেত বাক্সগুলির

ওজন একহাজার 'Kilo' (কিলো—এক সেরের কিছু উপর)। এই সমস্ত করতে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। হোটেলে যখন ফিরি তখন হয়তো রাত্রি বারোটা। তারপর আহারাদি শেষ করতে একটা বেজে যায়। তখনি হয়তো আমাদের ম্যানেজার এসে সুখবর দিয়ে যান—কাল ভোর ছ'টায় ট্রেন ধরতে হবে। তারপর ওই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিঠি লিখব—না ভ্রমণ-কাহিনী লিখব—না ঘুমিয়ে নেব— তা ভেবে পাই না। তবে, বড় বড় শহরে দু'-চারদিন করে থাকবার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু, সে সমস্ত জায়গা সম্বন্ধে ইউরোপ-যাত্রী অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন, সুতরাং, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে, আমরা কিন্তু, এমন সব দেশেও গিয়েছি যেখানকার লোক কখনও 'ভারতবাসী' কাউকে চোখে দেখেনি। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আমাদের গা-হাত টিপে পরীক্ষা করেও দেখেছেন যে আমাদের শরীর কী দিয়ে গড়া—রক্তমাংসের—না—তালপাতার! প্রসঙ্গত একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার এক বন্ধু লন্ডনে কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে—সেই বাড়ির একটি মেয়ে তাঁর গায়ের রং হাত দিয়ে ঘষে পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আপনাদের দেশের রং এত পাকা?' বলা বাহুল্য বন্ধুবরের গাত্রবর্ণের কালিমা একটু গাঢ় ছিল। জার্মানিতে শেষ অভিনয় হয় Hers burg-এ। তারপর Auto Bus-এ Zitlon-এর ভিতর দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াতে গেলুম। সেখানকার রাজধানী Prague (Prag বা Praha)-তে ২২শে মার্চ আমাদের নৃত্যাভিনয় ছিল। কয়েকটি বিশেষ ঘটনার জন্য 'প্রেগে'-র কথা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২২শে মার্চ অভিনয় হবার পর সেখানে আমরা চার দিন ছিলুম। এখানকার বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, চিত্রকর ও সংগীতবিদ্‌গণের সঙ্গে মিশবার ও আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এখানকার কয়েকজন মনীষীর নামে পরিচয়-পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের

মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Madam Venok। এই মহিলাটির মাতৃভূমি হচ্ছে প্যারি, কিন্তু তিনি বিবাহ করেছেন এই দেশে। Mr. Venok তদানীন্তন প্রেগের প্যারিস্থ কনসল জেনারেল ছিলেন। এখন তিনি ওই পদে সুইডেনে আছেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে ওই সূত্রে বিশেষ আলাপ হয়েছে— Laichtererove, General Vladimir Klacanda প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভবনে আমাদের আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সেই সমস্ত মজলিশে এখানকার বিশিষ্ট লোক, কবি, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর ও সমালোচকবর্গের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। এ সমস্ত জায়গায় আমার স্বরোদ এবং বিষ্ণুদাস সিরালীর সেতার বাজনাও হয়েছিল। এঁদের ভাব দেখে মনে হল এঁরা খুবই খুশি হয়েছেন এবং সকলেই খুব আগ্রহ সহকারে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। General Vladimir-এর বাড়ির নিমন্ত্রণে এখানকার আর্ট কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, বিখ্যাত সংগীত-রচয়িতা ও বহু গায়ক বাদক এবং পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। জেনারেল রাশিয়াতে দশ বৎসর ছিলেন। এঁর যুদ্ধের সময়ের জীবনের ঘটনাবলী সত্যই অদ্ভুত এবং অসাধারণ। এঁর বাড়িটি একটি 'মিউজিয়ম'-বিশেষ। যেখানকার যা কিছু দুষ্প্রাপ্য এবং পুরাতন প্রায় সবেরই সংগ্রহ ইনি করেছেন এবং সকল বিষয়েই এঁর জ্ঞান অনন্যসাধারণ। ইনি এঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং অমূল্য সংগ্রহ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করবার সংকল্প করেছেন। ইনি সর্বশেষে আমাদের একখানি সযত্ন-রক্ষিত পুস্তক দেখিয়ে বললেন—'এইটাই আমার জীবনের সর্বস্ব, এবং অন্তরের ধন।' আমরা সন্তর্পণে সেই পুস্তকখানি খুলে দেখলুম সেটি—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'! তিনি বললেন যুদ্ধের সময় যখন তিনি 'পেট্রোগ্রাডে' (বর্তমান 'লেনিনগ্রাড') মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শোচনীয় মানসিক অবস্থা লক্ষ করে বিখ্যাত রাশিয়ান জেনারেল Alex Aladin তাঁকে এই বইখানি

পড়তে দেন এবং তাঁরই কৃপায় Genl. Vladimir-এর অপূর্ব নবজীবনের সূত্রপাত হয়। তিনি আরও বললেন, যুদ্ধের সময় মানসিক শান্তি প্রায় সকলেরই চলে গিয়েছিল, সেই সময়ে পরম্পরাগত ভাবে সৈন্যদের মধ্যে গীতাপাঠের প্রচলন খুবই বেশি হয়েছিল এবং এখনও Ex-soldier এবং জেনারেলদের মধ্যে গীতাপাঠ নিয়মিত ভাবেই চলছে এবং ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। আমি তাঁকে বললাম যে 'বহু পুরাকালে সে এক মহাযুদ্ধের সময়েই আমাদের দেশে "গীতা"র প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল এবং আশ্চর্য এই যে বিংশ শতাব্দীর এক মহাযুদ্ধেই আপনাদের দেশেও সেই "গীতা"র প্রচার ও প্রসার শুরু হয়েছে!'

আমাদের দেশে অনেকেই আমাদের পুরাকীর্তি ও সভ্যতা স্মরণে রোমাঞ্চিত হন এবং আধুনিক যা কিছু সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলেন—এবং সেই অতীত গৌরব-গাথা কীর্তন ছাড়া নূতন কিছুর প্রচেষ্টাকে তাঁরা অপরাধ বলেই মনে করেন। নানা কারণে যদিও সেই সমস্ত গোঁড়া মতবাদীর নিকট হতে 'শত হস্তেন' থাকতে চাই, তথাপি বিদেশি মনীষীদের মুখে আমাদের বিগত গৌরবের জয়গান শুনে আমরা সত্যই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি। জেনারেল কথাপ্রসঙ্গে আমাদের পরাধীনতার কথা উল্লেখ করে বললেন 'আপাত দৃষ্টিতে তোমাদের যে রকম অসহায় ও বন্দি বলে মনে হয়, আমার মতে তোমরা ততটা অসহায় নও। রাজনীতির কথা বাদ দিলে সভ্যতা বা কালচারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতিসঙ্ঘে তোমাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এটা আমার নিজের মত নয়—ইউরোপের বিদ্বজন সমাজের এই মত, এবং তাঁরা তোমাদের শ্রদ্ধার সহিতই দেখেন। তোমাদের দর্শনশাস্ত্র, যা ইউরোপীয় সভ্যতার কত যুগ পূর্বে রচিত,—আমাদের বিস্ময়ে মুগ্ধ করে দেয়। তোমাদের 'পুষ্পক-রথ' আমাদের 'এয়ারোপ্লেনে'র সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। তোমাদের অমর কবি

কালিদাসের অপূর্ব কবিত্ব-সম্পদ এবং মহাভারত বা রামায়ণের মতো বিরাট সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস রচনা জগতের আর কোথাও সম্ভব হয়নি। পুরাতন যুগের কথা বাদ দিলে আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষ,—সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি কলা-সৃষ্টির দিক দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবি করবার যোগ্যতা রাখে। মহাত্মা গান্ধী—যাঁর তুলনা 'জিসেস ক্রাইস্ট', 'বুদ্ধদেব' বা স্বয়ং 'ভ গ বা নে র' সঙ্গেই করা যেতে পারে; রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের মধ্যে অন্যতম। ব্যক্তিত্বে ও সর্বতোমুখী প্রতিভায় এঁর সমকক্ষ কেউ পৃথিবীতে জন্মেছেন বলে মনে হয় না। স্বর্গীয় মহাপুরুষ তিলক, বিবেকানন্দ প্রভৃতির জন্ম যে জাতির মধ্যে, তার গৌরব কখনও ম্লান হবে না—ইত্যাদি' এর উপর আমাদের টিপ্পনীর বোধহয় আবশ্যক নেই। এই ধরনের উচ্ছ্বাস আমরা অনেকের কাছ থেকেই শুনে থাকি, বিশেষত জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে। তার কারণ বোধহয় সংস্কৃত-চর্চা এই দুই দেশেই বেশি হয়ে থাকে। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এই জেনারেলের স্ত্রী সংস্কৃতে একজন বড় 'স্কলার'। পরে তিনি আমাদের স্থানীয় জিমনাস্টিক ক্লাবে (Soho) নিয়ে গেলেন। এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর আমাদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, রাস্তার কুলি থেকে দেশের বড় বড় লোক সবাই এর সভ্য। অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা গরিবের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে। রাস্তার মুটে এখানে 'জেনারেল'-কে 'ব্রাদার জেনারেল' বলে সম্বোধন করে। পরদিন Dr. Lesny-র বাড়িতে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। ইনি এখানে সংস্কৃতের প্রফেসর। বহুকাল ভারতে কাটিয়েছেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনেও ইনি অনেক দিন ছিলেন এবং বাংলায় বেশ কথা বলতে পারেন।

Mr. Laichterserove-র নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, ইনি বিখ্যাত Meysariks গ্রন্থাবলীর প্রকাশক। ২৩শে মার্চ সান্ধ্য-ভোজনে

এঁর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। এখানে অনেক কৌতূহলী ভদ্রলোক এবং মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

Prague-এ আমাদের অভিনয় খুবই ভাল হয়েছিল। সাত দিন আগে থেকেই সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছল। উদয়শঙ্করকে 'শিবতাণ্ডব' চার-পাঁচ বার উপর্যুপরি নাচতে হয়েছিল। শেষকালে সকলের পুনরাহ্বান উপেক্ষা করেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। দেবশঙ্করের 'ব্যাধ-নৃত্য' এবং বিষ্ণুদাসের 'তবলা-তরঙ্গ' ও সেতার এখানে বিশেষভাবেই সমাদৃত হয়েছে। আমরা যেখানেই নেমেছি, অভিনয়ের পর সর্বত্রই বহু অভিনন্দন, প্রশংসা এবং নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি। কিন্তু এখানকার পত্রগুলিতে একটু বিশেষত্ব লক্ষ করলুম। অধিকাংশ পত্রেরই আরম্ভে দেবনাগরী অক্ষরে কিছু না কিছু লেখা আছে—যথা কোনও চিঠিতে (ওঁ ভগবতে ব্রহ্মণে নমম্) কোনওটাতে (ভগবতে গুরবে নমঃ) ইত্যাদি।

২৯শে মার্চ আমরা 'প্রেগ' ত্যাগ করে Auto Bus-এ ৬৫০ মাইল দূরে 'বুদাপেস্ট'-এ গেলাম। 'বাস'-এর পক্ষে এখানকার রাস্তা খুবই খারাপ। হাঙ্গারির সীমানায় একজন প্রান্তরক্ষী সৈনিক আমাদের আটক করে 'পাসপোর্ট' দেখতে চাইলেন। আমরা আবশ্যকীয় কাগজপত্র নিয়ে তাঁর কাছে গেলুম—তিনি তখন বাদাম ভেঙে খাচ্ছিলেন, টেবিলের ওপর আট-নটা আস্ত বাদাম তখনও পড়ে ছিল—সেগুলি শেষ করতে তাঁর আরও সাত-আটটা মিনিট লাগল। আমরা সময় কম বলে তাঁকে সেই খাওয়ার মধ্যেই তাড়া দিচ্ছিলুম, কিন্তু, তিনি জীবনে কখনও এত বড় মোটরগাড়ি দেখেননি—সন্দেহক্রমে প্রত্যেক জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে ঝাড়া দুটি ঘণ্টা বাদে আমাদের নিষ্কৃতি দিলেন। বুদাপেস্ট অপেরা হাউসে পৌঁছুতে সন্ধ্যা ছ'টা বাজল। নৃত্য আরম্ভ সাড়ে সাতটায়। অত আগে থেকেই প্রেক্ষাগারে ভীষণ ভিড় হয়েছিল—এখানেও তিনদিন পূর্বে সমস্ত টিকিট নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

এখানকার 'অপেরা হাউস'-এ প্যারির 'সাঁজলিজ' থিয়েটারের মতো শুধু অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর অভিনয় ছাড়া অন্য কিছু প্রদর্শনের অনুমতি পাওয়া যায় না। যুদ্ধের পরে এই থিয়েটারে একমাত্র জগদ্বিখ্যাত 'আনা পাভলোভা' নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন;—তার পরে আর কেউ এখানে নৃত্য প্রদর্শনের অনুমতি পাননি; সুতরাং, যুদ্ধের পরে আমরাই এখানে দ্বিতীয় দল সেই সম্মান পেয়েছিলুম। সেদিন এখানকার গবর্নর, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রমুখ প্রধান রাজপুরুষ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পূর্বপূর্ব বারের ন্যায় এখানেও আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দিত ও প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছি। উদয়শঙ্কর প্রত্যেক নৃত্যের পর একাধিক পুষ্পমাল্য ও প্রচুর পুষ্প-স্তবকের অঞ্জলিতে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন!

Prague থেকে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে এখান থেকে আবার সেখানে দু দিন নৃত্যপ্রদর্শনের জন্য যেতে হয়েছিল। পরে আমরা Bratisalava-তে যাবার জন্য রওনা হলুম। আমাদের বাস এখান থেকে প্যারিতে ফেরত পাঠালাম। কারণ, Alps-এর দিকের রাস্তা বাসের পক্ষে নিরাপদ নয়।

৩রা এপ্রিল আমরা 'ভিয়েনা'-র Volks Opera-তে নৃত্য প্রদর্শন করি। আমাদের এখানকার অভিনয়ও নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লোখযোগ্য। পরম শ্রদ্ধেয় সর্দার প্যাটেল এখানে উপস্থিত ছিলেন। বেলা তিনটার সময় নাচ আরম্ভ হল—প্রথম বিরতির পরেই ডাঃ অগ্নিহোত্রী নামে একজন আগ্রার ভদ্রলোক্ দর্শকের আসন থেকে লাফিয়ে 'স্টেজে'র উপর উঠে পড়ে বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। আমরা প্রথম মনে করেছিলুম তিনি নৃত্য সম্বন্ধেই বুঝি বা কিছু বলছেন; পরে শুনলুম তা নয়, ইনি রাজনীতিক বক্তৃতা শুরু করেছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনও রকমে নিরস্ত করতে না পেরে পর্দা ফেলে দিলেন। পরিশেষে সর্দার প্যাটেল আমাদের যথেষ্ট সুখ্যাতি করে বললেন, তিনি ভাবতেই পারেননি যে, ইউরোপে এসে এই ধরনের উচ্চশ্রেণীর

ভারতীয় নৃত্য ও সংগীত দেখা এবং শোনার সৌভাগ্য তাঁর হবে—ইত্যাদি। এখানে অভিনয় আমাদের ছ'টার সময় শেষ হল। সাড়ে সাতটার ট্রেনে রওনা হতে হবে, Triesty (ইটালি) যাবার জন্য। সমস্ত যন্ত্রাদি বাক্সবন্দি করে রেল স্টেশনে পাঠাবার পর দেখা গেল—উদয়শঙ্কর ভয়ংকর ভিড়ের মধ্যে আটকে পড়েছেন এবং অসংখ্য মেয়েদের 'অটোগ্রাফ' সই করছেন। খানিক অপেক্ষা করে বুঝলুম এভাবে সই করলে আজ ট্রেন পাওয়া অসম্ভব; কাজেই তাঁকে উদ্ধার করতে রাজেন্দ্রকে এগিয়ে দিলুম। সে একেই ভীষণ লাজুক, তার উপর অতগুলি মেয়ের মধ্যে গিয়ে উদয়শঙ্করকে উদ্ধার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সে বেচারা কোনও রকমে একটা ট্যাক্সির আড়ালে দাঁড়িয়ে তার দাদাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলে। তখন মাত্র কুড়ি মিনিট সময় আছে। যাই হোক, অতি কষ্টে তো তাঁকে উদ্ধার করে ট্যাক্সিতে তুলে স্টেশনের দিকে রওনা হলুম—কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। ডজন খানেক ট্যাক্সি ও মোটরে অসংখ্য ছেলেমেয়ে তাদের অটোগ্রাফ আন্দোলন করতে করতে উদয়শঙ্করের পিছনে তাড়া করলে। আমরা খুব বেগে 'ড্রাইভ' করে রেল স্টেশনে এসে উদয়শঙ্করকে একটা কামরার মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলুম। সেখানে বসে তিনি যত পারুন সই করুন আমাদের কোনও রকম আপত্তি ছিল না। স্টেশনে আমাদের বিদায় দেবার জন্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে ট্রেন সুদূর গন্তব্যপথে যাত্রা করলে।

ইটালিতে আমরা Triesty, Padova, Bologna, Bolzeno, Parma, Verona, Genoa, Venice, Florence, Torrins ও Milano শহরে নৃত্যাভিনয় দেখিয়েছি। Milano-র হোটেলে একজন ইংরেজি জানা ইটালিয়ান ফাসিস্ট ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'মহাত্মা গান্ধী এখানে এসেছিলেন এবং এমন কী মুসোলিনির হস্তও স্পর্শ করেছিলেন।' উদয়শঙ্কর এই

কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—'মহাত্মাজির হস্ত স্পর্শ করবার অধিকার পাওয়া মুসোলিনির পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলতে হবে—কারণ, যুগে যুগে অনেক মুসোলিনি জন্মাবেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বোধহয় আর জন্মাবেন না।' এই ফাসিস্টদের ভেতর মুসোলিনি সম্বন্ধে এত বড় স্পর্ধার কথা কেউ বলতে পারে এ-কথা সেই ভদ্রলোক বিশ্বাসই করতে পারেননি! তিনি তো থতমত খেয়ে গেলেন! তাঁর মুখ দেখে মনে হল যেন তিনি স্বকর্ণকে অবিশ্বাস করছেন। আমরা তো প্রমাদ গণছি—ইটালিতে বসে মুসোলিনিকে অবজ্ঞা! এর পর ফিরতে পারব তো? যাই হোক, অতি কষ্টে ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে ভদ্রলোকটিকে শান্ত করলুম।

ভেনিসে একজন বাঙালি ভদ্রলোক (নামটা না লেখাই ভাল) আমাদের অভিনয়ের পর উদয়শঙ্করকে এক চিরকুট লিখে পাঠালেন, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, বাইরে এসে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন।' তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট্য যে তিনি একজন বিশ্ববরেণ্য বাঙালি মনীষীর জামাতা। অবশ্য এ-পরিচয়ের উল্লেখ তাঁর সেই পত্রেই ছিল। উদয়শঙ্কর বিস্মিত হয়ে বললেন—এ ধরনের অশিষ্ট পত্র পাওয়া তাঁর নৃত্যজীবনে এই প্রথম, অর্থাৎ বাইরে গিয়ে দেখা করবার রূঢ় আদেশ তাঁর জীবনে এই প্রথম এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তা-ও এক স্বজাতির কাছ থেকে। এখানকার অভিজাত সম্প্রদায়, লর্ড, ডিউক, রাজবংশীয়, কবি, পণ্ডিত, রাজপুরুষগণ, সকলেই দেখা করবার বা আলাপ করবার দরকার হলে নিজেরাই ভিতরে এসে দেখা করেন; অথবা উদয়শঙ্কর যতক্ষণ না বাইরে বেরিয়ে আসেন ততক্ষণ বাইরেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। এমনকী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্যাটেল পর্যন্ত এই নিয়মই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু, এই জামাতা পরিচয়ধারী ভদ্রলোকটির অদ্ভুত ব্যবহার দেখে আমরা সত্যই আশ্চর্য বোধ করেছিলেম। এঁর 'জামাতৃগর্ব' পরে আমাদের মধ্যে একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিলানোতে আর একজন ভারতবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল; ইনি স্থানীয় শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিভাগের ভার নিয়ে এসেছেন। ইনি উদয়শঙ্কর ও তাঁর পিতৃদেবকে বহুকাল থেকেই জানতেন, কাজেই আমাদের অভিনয়ে তাঁকে আমরা সাদরে নিমন্ত্রণ করেছিলেম। আমাদের ম্যানেজার তাঁকে দেখে এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর এত ঘনিষ্ঠতা দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন। পরে বললেন—'আপনাদের এখানে আগমন সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন এঁর ভারতীয় স্টলে আমি রাখতে চেয়েছিলাম—এবং তার জন্য যতগুলি 'ফ্রি পাশ' তাঁর আবশ্যক তাও দেব বলেছিলাম, কিন্তু উনি কিছুতেই রাজি হলেন না, বরঞ্চ আমাকে অভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিলেন!' কথাটা শুনে আমরা একটু দুঃখিত হলুম বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এখানে আমরা দুর্ব্যবহার যা কিছু পেয়েছি তা সাধারণত স্বদেশবাসীর কাছ থেকেই, এবং নিন্দা বা কুৎসা তাঁদের দ্বারাই প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। এখানে কোথাও দেশের লোক দেখলেই আমরা ছুটে যাই আলাপ করবার জন্য—কিন্তু, সাধারণত আমরা তাঁদের কাছে প্রথম উপদেশ পাই—'আস্তে কথা বলবেন!! আর অত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন না মশাই!! তা এখানে থাকতে থাকতেই ক্রমে সব অভ্যেস হয়ে যাবে ইত্যাদি'; অবশ্য পরে যখন শোনেন যে আমরা কতদিন ইউরোপে আছি এবং কোথায় কোথায় গিয়েছি এবং কার কার সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তখন তাঁরা বেশ একটু দমে যান। অবশ্য, এগুলি শুধু ব্যতিক্রমের কথা, না হলে স্বদেশবাসী এখানে আরও অনেকেরই সঙ্গে দেখা হয়েছে, সবাই এমন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে আমরা আতিথ্য, যত্ন, সহানুভূতি এবং আন্তরিকতা যথেষ্ট পেয়েছি।

মিলানো থেকে আমরা বরাবর ট্রেনে বার্লিনে এসেছি। এই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ভুলতে পারব না। অভ্রংলিহ তুষার-শুভ্র পর্বতশ্রেণী, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিকাপাতের ন্যায় ক্ষুদ্র



তাণ্ডব নৃত্যে—রবীন্দ্র, উদয়শঙ্কর, তিমিরবরণ



Koln গির্জার সম্মুখে ভারতীয় নর্তক-দল



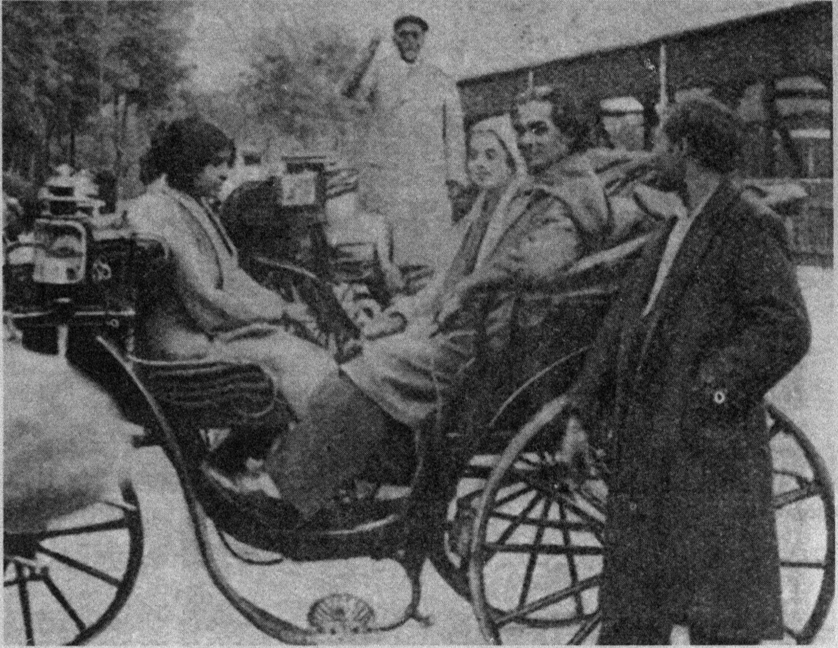
ফ্রান্স ও জার্মানির সীমান্তে তিমিরবরণের বস্ত্রাদি কাস্টম অফিসাররা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছে—সিগারেট আছে কি না।



বার্লিনের পথে



Auto Bus-এর ভিতরের দৃশ্য



শহর ভ্রমণে (Bael Elster) ফিটনে—শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর, শ্রীমতী শিমকী। সম্মুখে—শ্রীমতী মীনা। পদব্রজে—শ্রীমান রাজেন্দ্র ও ব্রজবিহারী। শ্রীযুক্ত কেদারশঙ্কর হাত তুলে বিদায় দিচ্ছেন। (ছবি তুলেছেন—তিমিরবরণ)

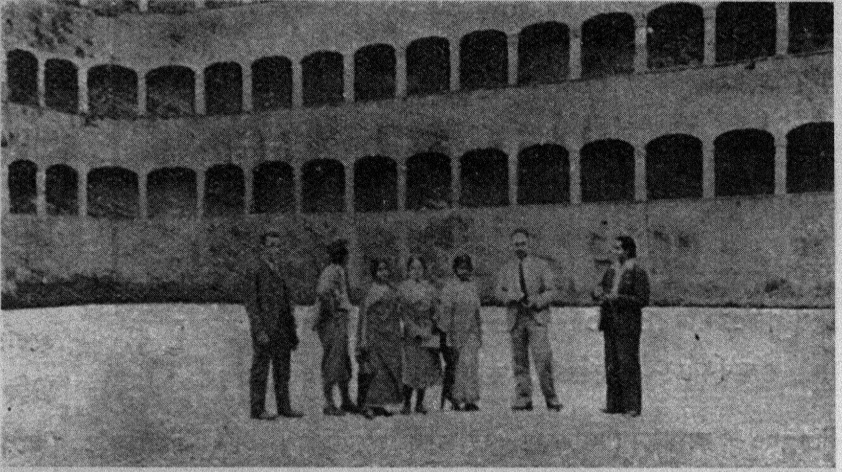


ভারদুনের রণক্ষেত্রে (Verdun) বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের চিহ্নাবশেষ দেখবার জন্য সকলেই 'বাস' থেকে নেমেছেন। যুদ্ধের পর এই সবেমাত্র এখানে আবার তরুলতা জন্মাতে শুরু করেছে। (ছবি তুলেছেন—তিমিরবরণ)

বর্ষার বাজার (Europe) পথের ধারে বড় বড় ছাতার নীচে অসংখ্য দোকান বসেছে। (ছবি তুলেছেন—তিমিরবরণ)



ক্রীড়াক্ষেত্র (Mannheim-Germany), এই ক্রীড়াক্ষেত্র বর্তমান যুগ-পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত হয়েছে। সবরকম খেলা এখানে হতে পারবে, তা ছাড়া কিরণ-স্নান, (Sun-bath) নির্মলবায়ু সেবন প্রভৃতি স্বাস্থ্যোন্নতির বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও সব এখানে আছে। (ছবি তুলেছেন—রাজেন্দ্রশঙ্কর)

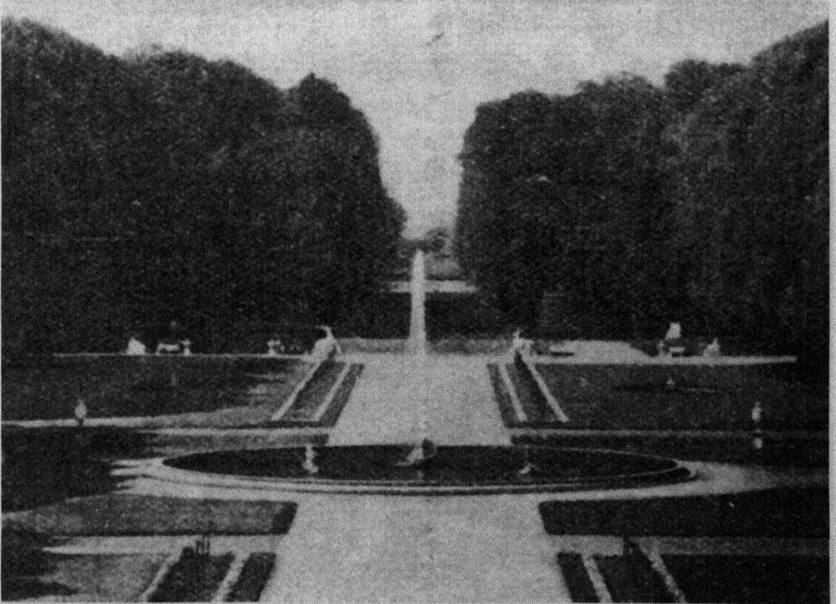


নাট্য-প্রাঙ্গণ (Salzburg-Germany) গ্রিক amphetheatre-এর মতো উদার আকাশের নীচে উন্মুক্ত রঙ্গভূমি। (ছবি তুলেছেন—তিমিরবরণ)

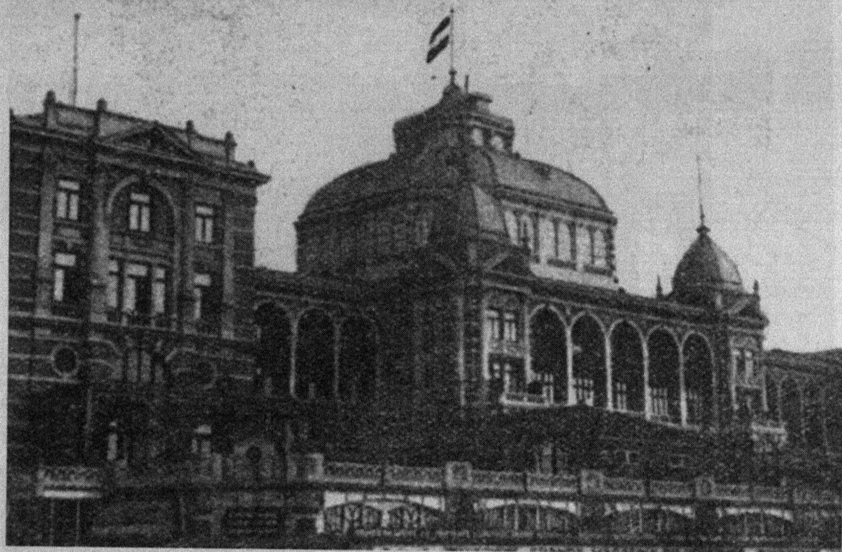
রাজপ্রাসাদ (Salzburg-Germany) প্রাচীন রাজপ্রাসাদের স্বর্ণখচিত কারুকার্য। (ছবি তুলেছেন—উদয়শঙ্কর)



পার্বত্য শহর (Salzburg-Germany) পাহাড়ের উপর থেকে Salzburg শহরের অপূর্ব দৃশ্য। (ছবি তুলেছেন—উদয়শঙ্কর)



প্রমোদ-উদ্যান (Schwetzingen-Germany) এখানকার এই প্রমোদ-উদ্যানটি হুবহু ফরাসি দেশের Versailles শহরের প্রমোদ-উদ্যানের অনুকরণে তৈরি। সমস্ত ইউরোপ যে একদিন ফরাসিদের ছন্দানুবর্তী ছিল এ সমস্ত তারই জাজ্বল্যমান নিদর্শন। (ছবি তুলেছেন—উদয়শঙ্কর)



রঙ্গালয় (Chevninzen-Germany) এই বিরাট রঙ্গালয়ের বিশাল নাট্যমঞ্চে উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান হয়েছিল। (ছবি তুলেছেন—তিমিরবরণ)



মকরসংক্রান্তি নৃত্য, গঙ্গা-পূজারিণী শ্রীমতী মীনা। (বাম দিক হইতে কেদারশঙ্কর, বিষ্ণুদাস, তিমিরবরণ, বেচু, রাজেন ও ব্রজবিহারী)



কিরাত নৃত্য, ব্যাধ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রশঙ্কর



শিব তাণ্ডব-নৃত্য। (বাম দিক হইতে বিজয়া—শ্রীমতী মীনা, পার্বতী—শ্রীমতী শিমকী, শিব—শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর, গজাসুর—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রশঙ্কর)



সরোদ-সাধক—তিমিরবরণ



ভীল-নৃত্য, ভীল—শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর, ভীলবালা—শ্রীমতী শিমকী (বাঁ দিকে—ব্রজবিহারী, রাজেন্দ্রশঙ্কর, অন্নদাচরণ)



পথের বিপদ (Prague-Budapest) রাস্তার মাঝখানে বাসের এঞ্জিন বিরূপ হওয়াতে সকলে মিলে গাড়িখানি ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (ছবি তুলেছেন—রাজেন্দ্রশঙ্কর)



সেতুপথ (Prague-Czechoslovakia) প্রেগ শহরের প্রাচীন তোরণদ্বারের ভিতর দিয়ে শহরে প্রবেশের যে সুন্দর সেতুপথ দেখা যাচ্ছে এর দু'পাশে ধর্ম-পুরাণোক্ত অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষগণের প্রতিমূর্তি আছে। (ছবি তুলেছেন—রাজেন্দ্রশঙ্কর)

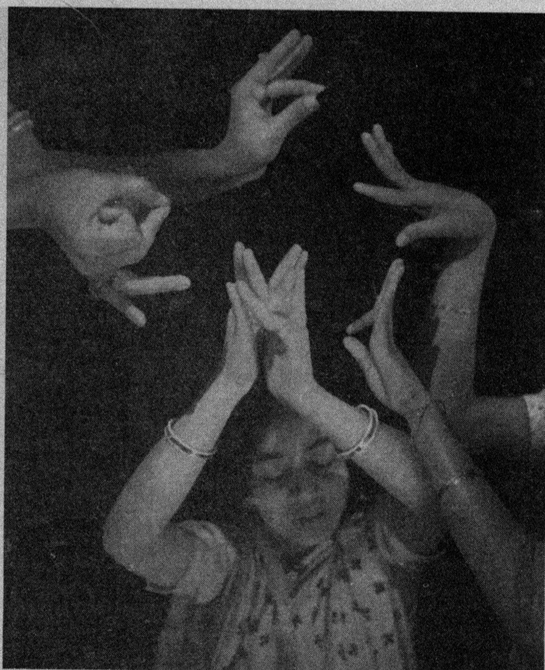
বালি প্রদর্শনী (Sen Haag) প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বার (ছবি তুলেছেন—তিমিরবরণ)



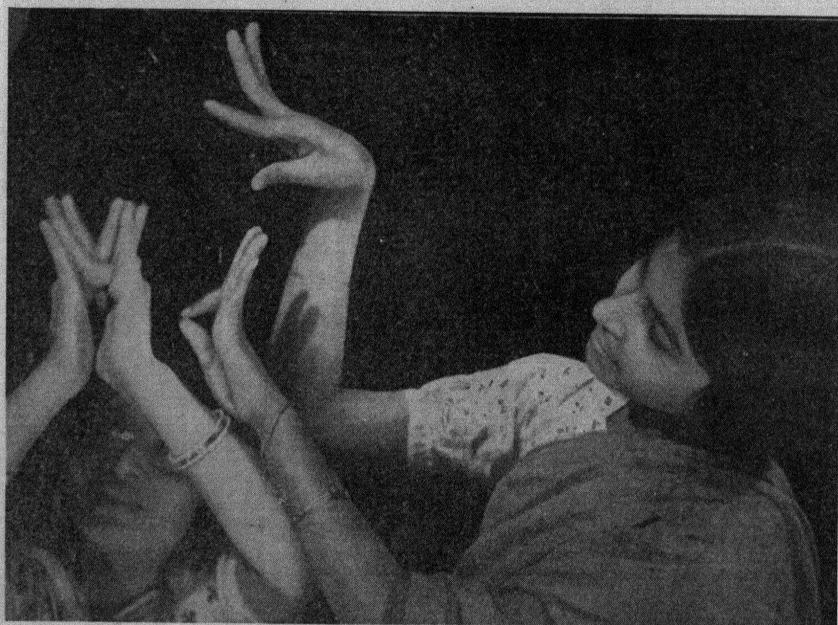
শিবনৃত্যে—'পার্বতী'। পার্বতী—শ্রীমতী শিমকী



শিবনৃত্যে শিব। শিব—শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর



কয়েকটি মুদ্রা (উদয়শঙ্কর, মীনা, অমলা নন্দী)



মুদ্রা (বামে মীনা, দক্ষিণে অমলা)

ক্ষুদ্র নদীর আবেষ্টন, বিশাল হ্রদ প্রভৃতির নয়নাভিরাম মনোরম দৃশ্য মানসপটে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯শে এপ্রিল প্রাতঃকালে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়ে আমরা বার্লিনে এসে পৌঁছুলাম। প্লাটফর্মে অবতরণের সঙ্গে-সঙ্গেই বিশ-পঁচিশজন রিপোর্টার আমাদের ঘেরাও করলেন। তা ছাড়া, বিস্তর ফটোগ্রাফার এবং কয়েকটি সবাক চলচ্চিত্রের সরঞ্জাম, তীব্র আলোক কিছুরই অভাব ছিল না। এই সমস্ত রিপোর্টার প্রায় সবদেশেই আমাদের পাকড়াও করেন। তাঁদের প্রশ্নও কতকটা একই ধরনের। যথা—উদয়শঙ্করকে প্রশ্ন—আপনি কি কখনও ইউরোপীয় নৃত্য দেখেছেন?

উত্তর। অনেকবার! এবং সমস্ত বিখ্যাত নর্তক ও নর্তকীর নৃত্য দেখেছি।

প্রঃ। আপনার কি খুব ভাল লাগে?

উঃ। যা সত্যকার ইউরোপীয় এবং Classical তা সত্যই ভাল লাগে।

প্রঃ। সত্যকার ইউরোপীয় মানে?

উঃ। অর্থাৎ আজকাল ইউরোপে যে নৃত্য শুরু হয়েছে, সেটা নানা দেশের নৃত্যের নকল, এতে মনে হয় ইউরোপে নৃত্যের ভাণ্ডার খালি হয়ে এসেছে। classical এবং খাঁটি ইউরোপীয় নৃত্য খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়—ইত্যাদি।

তারপরে সংগীত সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। উদয়শঙ্কর তখন আমাকে এবং বিষ্ণুদাসকে এগিয়ে দেন। সংগীত সম্বন্ধে প্রশ্নের নমুনা যথা—

প্রঃ। ইউরোপিয়ান ও হিব্রু সংগীতের তফাত কী?

উঃ। তফাত বোঝাতে গেলে আপনাকে হিন্দু সংগীত কিছু শিখতে হবে। তবে এটা জেনে রাখুন যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

প্রঃ। আপনাদের ইউরোপীয় সংগীত কী রকম লাগে?

উঃ। খুব ভালই লাগে—অবশ্য সবই যে ভাল লাগে তা নয়।

প্রঃ। আপনারা ভাল লোকের সংগীত শুনেছেন কি?

উঃ। নিশ্চয়ই। ক্রাইসলার, হ্বাইকেজ ম্যানহুইন, সিগোভিয়া, এনেস্কো শেলিয়াফিন প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞগণের গান ও বাজনা অনেকবার শুনেছি।

প্রঃ। আচ্ছা, আপনারা ভালমন্দ কী করে বিচার করেন?

উঃ। খুব সহজ উপায়ে। ভাল লাগলেই ভাল বলে থাকি, আর মন্দ লাগলেই মন্দ বলে থাকি। যাঁরা রসসৃষ্টি করতে পারেন তাঁদের গান বা বাজনা যে-কোনও লোকের ভাল লাগবেই।

এই ধরনের অনেক প্রশ্ন ও উত্তর হয়ে থাকে। ক্ষুণ্ন হবার প্রয়োজন নেই। উত্তরগুলি হচ্ছে 'Reporter's Special'—কতকটা ওই জাতীয় জীবের জন্য 'পেটেন্ট' করে নেওয়া। যাঁরা সত্যকার অনুসন্ধিৎসু তাঁদের অবশ্য আমরা ভাল করেই বোঝাবার চেষ্টা করি। তা ছাড়া, স্থান কাল ও পাত্রের কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, স্থান—রেলওয়ে স্টেশন; কাল—ক্ষুধার সময়; আর পাত্র—যাক সে-কথা না বলাই ভাল। এই সমস্ত প্রশ্ন ছাড়া রিপোর্টাররা মধ্যে মধ্যে নানা রকম আজগুবি প্রশ্নও করে থাকেন। যথা 'আপনারা কী খেয়ে থাকেন?' 'শুনতে পাই আপনারা সাপ, ব্যাঙ, বিছা, আরশোলা, ইঁদুর ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুদের ন্যায় (যেমন গোরু, বেড়াল, কুকুর ইত্যাদিকে) পুষে থাকেন? এ-কথা কি সত্য?' 'আপনারা কি গান্ধীর ভক্ত?'—ইত্যাদি। তবে শেষ অবধি ওই Reporter-রা আমাদের কাছে একটি করে গল্প (যা মনে আসে) শুনতে চান, এবং তাই টুকে নিয়ে প্রস্থান করেন। তারপর, ফটোগ্রাফার, সিনেমা, ম্যুভিটোন প্রভৃতির পালা। তাদের কৃত্রিম আলোয় চোখের দফা শেষ এবং সেই আলোর অসহ্য উত্তাপে একেবারে ভাজা হয়ে তবে নিষ্কৃতি।

বার্লিনে আমাদের উপর্যুপরি সাত দিন অভিনয় করতে হয়েছে। আমরা প্রথমটা একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম, কারণ

পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় রাজ-কর্মচারী, প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া এখানকার নামজাদা সংগীতজ্ঞ, সমালোচক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিদ্বজ্জন-সমাজের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এই সমস্ত বিশ্ববন্দিত মনীষীবৃন্দের কাছ থেকে আমরা যে রকম প্রশংসা এবং অভিনন্দন লাভ করেছি তা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। অভিনয়ের শেষে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে অনবরত আনন্দধ্বনি এবং করতালি চলছিল। এখানকার কাগজের সমালোচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, আমাদের সংগীত ও নৃত্যের উপর এদের শ্রদ্ধা কতটা বেড়ে গিয়েছে। এখানকার সমস্ত সাপ্তাহিক ও দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় আমাদের ছবি বেরিয়েছে। শুধু বার্লিনেরই প্রায় সাত শত কাগজের (দৈনিক ও সাপ্তাহিক) উচ্ছ্বসিত সমালোচনার 'কাটিংস' পেয়েছি। শীঘ্রই এগুলির অনুবাদ করে পাঠাবার ইচ্ছা রইল।

বার্লিনে 'হিন্দুস্থান হাউস' বলে একটা বাড়ি আছে। এটা একটা হোটেল বিশেষ। এখানে আমাদের দেশের সব রকম লোক দেখলাম, অর্থাৎ—বাঙালি, হিন্দুস্থানি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, মান্দ্রাজি, প্রভৃতি সর্ব জাতির সমন্বয়। এতগুলি স্বদেশবাসীকে একসঙ্গে পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। এখানকার হোটেলের রান্নাও একেবারে খাঁটি হিন্দুস্থানি। আমরা ক' দিনই এখানে খেয়েছিলুম। এঁরা সকলেই আমাদের বিশেষভাবে যত্ন করেছেন এবং নানা দিক দিয়ে সাহায্য এবং উৎসাহিত করেছেন। এখানকার ইন্ডিয়া ক্লাবের জুবিলি উৎসব উপলক্ষে খুব বড় ডিনার হয়েছিল। আমরা শুধু ভারতবর্ষীয় বন্ধুদের জন্য একদিন একটি বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠান করেছিলেম। সকলেরই যে খুব ভাল লেগেছিল এ-কথা বলা বাহুল্য। তবে, অনেকেই বলেছিলেন আমাদের দেশের তারের যন্ত্রের আওয়াজ খুব মৃদু, কাজেই একটা ক্লারিওনেট অথবা 'অর্গান' রাখলে সঙ্গতের দিক সর্বাঙ্গসুন্দর হত। এই দিক দিয়ে অবশ্য আমরা সকলেই যে

বিশেষ বেগ পেয়েছি, এ-কথা অস্বীকার করি না। ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য আমাদের কনসার্টে একটা Violin অর্থাৎ বেহালা পর্যন্ত ব্যবহার করিনি। তবে এ-কথাও ঠিক যে, আমাদের এই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমরা সর্বত্র সুখ্যাতিও পেয়েছি। তা ছাড়া ইউরোপিয়ানরা খাঁটি জিনিসই চায়—তাদেরই নকল করে তাদের কাছ থেকে একটুকুও বাহাদুরি পাওয়া যায় না—বরঞ্চ, তারা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। উদয়শঙ্করের নাচের ভিতর যদি একটুও বৈদেশিকতা থাকত তা হলে তিনি এভাবে সর্বত্র সমাদৃত হতেন না। আমাদের বাজনার ভেতর বিদেশি প্রভাব সযত্নে পরিহার করেছি বলেই সর্বত্র এর এত আদর হয়েছে। এমনকী আমাদের স্টেজের সাজসজ্জার এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যই পুরোপুরি বজায় রাখবার চেষ্টা সর্বতোভাবেই করি। এ সম্বন্ধেও কয়েকটি কাগজের সুখ্যাত সমালোচনা দেখেছি। ইউরোপে আরও অনেক ভারতীয় নর্তক ও নর্তকী আছেন, কিন্তু তাঁদের 'খিচুড়ি' সবাই পছন্দ করেন না। তার একমাত্র কারণ তাঁরা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেন না। বার্লিনে আরও সাত দিন নৃত্যাভিনয় প্রদর্শনের জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু ১২ই মে প্যারির সাঁজলিজ (Champs Elysses) থিয়েটারে আমাদের অভিনয়ের কথা আগে থেকেই ঠিক ছিল। প্রেসিডেন্ট ডুমারের শোচনীয় মৃত্যুতে এখানকার অভিনয় এক দিন পিছিয়ে গেছল। ১৯৩১ সালে ৩রা মার্চ সাঁজলিজে প্রথম অভিনয়ের পরে ১৩ই মে ১৯৩২ উক্ত থিয়েটারে পুনরাভিনয় নিয়ে ইউরোপে সর্বসুদ্ধ ১৯৩টি নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হল। এবার এই পর্যন্তই থাক।

৩

আমাদের এবারের সফরটা মাত্র দুই মাসের জন্য, কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকটি নূতন দেশ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তা ছাড়া, আগের প্রায় সমস্ত ভ্রমণ মোটরবাসে হয়েছিল, এবারে ট্রেনে, মোটর বোটে এবং স্টিমারে।

২৪শে মে ভোরবেলা আমরা রওনা হলেম ট্রেনে প্যারি থেকে হল্যান্ড (নেদারল্যান্ড)-এর রাজধানী আমস্টার্ডামের উদ্দেশে। নানা দেশের ট্রেনযাত্রায় অনেক রকম সুবিধা ও অসুবিধা আছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনায় এখানকার সর্বত্র ট্রেন-সিস্টেম যে খুবই উন্নত তা নয়—অবশ্য স্বাধীন দেশের সব বিষয়ে অনেক রকম সুবিধা আছে—তা ছাড়া জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধা বা অভাব-অভিযোগের দিকে এদেশের কর্তৃপক্ষের আমাদের দেশের কর্তাদের মতো উদাসীন থাকবার উপায় নেই। ফ্রান্সে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর অনেক তফাত। তার মধ্যে প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে, তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কোনও রকম রেস্তোরাঁ-কারের বন্দোবস্ত নাই। এখানকার রেল স্টেশনে খাবার জিনিস বা চায়ের ফেরিওয়ালাও বড় একটা পাওয়া যায় না—কাজেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ট্রেনে উপবাস ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু জার্মানি বা অন্য দেশে এ-অসুবিধা নেই—সে সমস্ত দেশে পৃথক পৃথক শ্রেণীর জন্য পৃথক রিফ্রেশমেন্ট-কারের বন্দোবস্ত আছে। ট্রেন যেই ফ্রান্স-এর সীমানা অতিক্রম করে তখনই অন্য দেশের রেস্তোঁরা-কার জুড়ে দেওয়া হয়; অর্থাৎ গাড়ি যে দেশের ভিতর দিয়ে যাবে সেই দেশেরই রেস্তোরাঁ-কার ওই গাড়ির সঙ্গে থাকা নিয়ম। একবার মিলানো (ইটালি) থেকে বার্লিনে যাচ্ছিলাম—পুরো চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তা। আমরা রেস্তোরাঁ-কারে নিষিদ্ধ মাংস বাদ দিয়ে অন্য যা কিছু আছে দিতে বললাম। প্রথমত তারা এমন

অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল যেন তারা এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু কখনও শোনেনি! যাই হোক তাদের কাছে—অন্য কোনও রকম মাংস না থাকাতে শুধু ডিম আর রুটি দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল। কিছু পরেই আমরা ইটালির সীমানা পার হয়ে জার্মানিতে প্রবেশ করলেম। তখন জার্মানির রিফ্রেশমেন্ট-কার ওই গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হল। এদেরও জিজ্ঞাসা করলাম নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া অন্য কোনও রকম মাংসের জোগাড় হবে কি না;—তারাও বললে, 'হ্যাম্' আর 'বিফ' ছাড়া অন্য কিছুই নেই—তবে জোগাড় করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কোনও একটি জংশনে আমাদের ট্রেনকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, সেই সুযোগে আমরা যা যা খাই সমস্ত এরা সংগ্রহ করে এনে আমাদের খবর দিল যে খাদ্য জোগাড় হয়েছে। আমরা নির্ভাবনায় থাকতে পারি। এই সমস্ত ছোট ছোট ঘটনা থেকে জার্মান জাতির উপর আপনা থেকেই একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠে। জনকয়েক ভারতবাসী যাত্রী কী খাবে বা না খাবে তার জন্য এত আয়াস স্বীকার করা অন্য কোনও জাতির দ্বারা হত কি না সন্দেহ। এ ছাড়া ইউরোপে ট্রেনযাত্রা সম্বন্ধে আরও অনেক রকম মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে; তার মধ্যে একটা ঘটনা উল্লেখ না করে থাকতে পাচ্ছি না। কিছুদিন আগে স্পেনে সান সিবাস্টিন থেকে বিয়ারিজ যাচ্ছিলাম উভয় দেশের দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল। কিন্তু ট্রেনে চড়েছিলাম সকাল সাতটায় এবং বিয়ারিজ-এ পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা পাঁচটায়। দশ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ ট্রেনের গতি হিসাব করিলে ঘণ্টায় চার মাইল দাঁড়ায়। আমরা ট্রেনে ওঠার পর প্রথমত সেটা নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টা দুই পরে চলতে আরম্ভ করল, তাও অতি ধীরে ধীরে—একেবারে যাকে বলে শম্বুক গতি! মধ্যপথে গিয়ে আবার হঠাৎ থেমে গেল! অনেকের দেখাদেখি আমরাও নেমে একটু এগিয়ে দেখি, লাইনের উপর একটি বিশালকায় বলীবর্দ

লম্বমান অবস্থায় রোমন্থন করছে। এঞ্জিনের বিকট আওয়াজ এবং তীব্র বংশীধ্বনিতেও তার ভ্রূক্ষেপহীন নির্বিকার ভাব দেখে মনে হল সম্ভবত এই প্রাণীটি বধির না হয় ওর উদ্দেশ্য আমাদের নিয়ে একটু রসিকতা করা। যাই হোক তাকে সকলে মিলে তাড়া দিয়ে এবং ল্যাজ মলে অতিকষ্টে তার বিশাল অলস বপুখানি তার নিতান্ত অনিচ্ছায় রেল লাইন থেকে অপসারিত করা গেল।

গাড়ি আবার কিছুদূর গিয়ে পুনরায় থেমে গেল! এবার আমরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম এঞ্জিন-চালক একটি বাড়ির দিকে চেয়ে হাত নেড়ে ভীষণ চিৎকার করছে। খানিক পরেই একটি বৃদ্ধা—(সম্ভবত ওই ড্রাইভারের ঠাকুরমা বা দিদিমা) বাড়ির ভিতর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল—ড্রাইভার তার হাতে একটা কুমড়া ও কতকগুলো ফল দিলে। বুড়ি নিয়ে গেল—তখন গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করল। কিছুদূর যাবার পর একজন রেল কর্মচারী এসে আমাদের কাছে ভাড়া বাবদ আরও কিছু আদায় করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললেন যে, এই ট্রেনখানি এতক্ষণ 'প্যাসেঞ্জার' ছিল এইবার 'এক্সপ্রেস' হয়ে গিয়েছে! কাজেই বাকি পথটুকুর জন্য বেশি ভাড়া লাগবে! আমরা কিন্তু পথের শেষ অবধি গিয়েও গাড়িখানি যে কী হিসাবে কোন সময়ে 'এক্সপ্রেস' হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারিনি, কারণ তার সেই আদর্শ মন্থর গতির কোথাও তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি! যাই হোক হয়তো বা এই নামে-এক্সপ্রেস না হলে এ-গাড়ি আরও দেরিতে পৌঁছত—অথবা একেবারেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারত না! ইউরোপের মতো নামজাদা সভ্য দেশে এ-ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে—বিশ্বাস করা শক্ত হবে—কিন্তু সেখানেও সত্যিই এই কাণ্ড হচ্ছে। শুনেছি, আমাদের দেশেও একবার কোনও এক ট্রেনের গার্ড এবং ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিকটস্থ এক গ্রামে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য যাত্রা শুনতে গিয়েছিলেন; এবং আর একবার কোনও

নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য রেলপথের গোঁড়া ব্রাহ্মণ গার্ড সাহেব পথের মধ্যে ট্রেন থামিয়ে কর্ণে উপবীত জড়িয়ে জলপাত্র হস্তে কিছুক্ষণের জন্য পার্শ্ববর্তী জঙ্গল মধ্যে প্রয়াণ করেছিলেন। আমরা বাইরে থেকে ইউরোপকে কল্পনায় যা মনে করতাম বাস্তবে ইউরোপ তা নয়; সকলেই যে সেখানে বিদ্বান বা অসম্ভব মার্জিত রুচি অথবা দিনরাত কাজকর্মেই ব্যস্ত, এদেশের মতো অলস বা দীর্ঘসূত্রী এবং বেকুব লোক যে সেদেশে একেবারেই নেই এ ধারণা করবার কোনও কারণ নেই। তবে এদের দেশে একটা প্রাণের সাড়া আছে, সম্ভবত স্বাধীন দেশ বলেই; তা ছাড়া এদের দেশাত্মবোধ, স্বজাতিপ্রীতি এবং ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে সব কাজে যোগ দেওয়া, আমোদ-উৎসব খেলা-ধূলায় ও হাস্য-পরিহাসে সকলের অবাধ মেলামেশা এবং ভাবের আদান-প্রদান আমাদের সত্যই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে তোলে! মধ্যে মধ্যে মনে হয় যেন কোনও আশ্চর্য দেশে এসে পড়েছি।

যাক—আমরা যাচ্ছি—আম্‌স্টার্ডামে বেশিক্ষণ আমাদের ট্রেনে থাকতে হবে না, বিকাল বেলাই সেখানে পৌঁছে যাব। যখন হল্যান্ডের সীমানায় এলাম—ভয় হচ্ছিল গতবারের মতো কাস্টমস অফিসে আবার স্বরদ খুলে বাজিয়ে শোনাতে না হয়। কাস্টমস অফিসাররা আবার সমস্ত বাক্স খুলতে হুকুম দিলেন। আমরা বললাম যে, পনেরোটি বাক্স আমাদের সঙ্গে আছে। সবগুলি খোলা কষ্টকর এবং আপনাদের পক্ষেও অসুবিধা—আপনারা যে-কোনও বাক্স খুলতে বলুন আমরা খুলে দিচ্ছি। এবারে তাঁরা এই কথাতেই রাজি হলেন এবং কয়েকটি বাক্স খুলিয়ে এদিক-ওদিক নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা শেষ করলেন। মনে হল হয় এঁরা চাকরিকে ফাঁকি দিচ্ছেন—নয় তো আমাদের কষ্ট দেওয়া এবং অসুবিধায় ফেলাই এঁদের চাকরি! এঁরা কী ভাবে খোঁজ করেন তা আমাদের জানা আছে এবং ইচ্ছা করলে সকলেই নিষিদ্ধ জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। এঁদের মধ্যে

একজন উদয়শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার হল্যান্ডে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী?' উদয়শঙ্কর জবাব দিলেন 'উদ্দেশ্য কিছু টাকা রোজগার।' তাতে সে ভদ্রলোক একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে খুবই বিনীতভাবে বললেন, 'দেখুন মশিয়ে, হল্যান্ড-এর অবস্থা এখন বড়ই খারাপ। এ সময়ে সেখানকার টাকা বিদেশে নিয়ে যাওয়া আপনার সমীচীন হবে না।' উদয়শঙ্কর জবাব দিলেন 'বেশ এবারে না হয় কিছু দিয়েই আসব।' ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে অনেক ধন্যবাদ দিতে দিতে চলে গেলেন।

আমস্টার্ডামে—আমরা পাঁচ দিন ছিলাম; এর মধ্যে তিন দিন আমস্টার্ডাম ও দু'-দিন 'রতার্দাম' (Rotterdam) (Chevmingen) 'চেভমিনজেনে' আমাদের নৃত্যাভিনয় ছিল। শেষোক্ত দুটি দেশে আমরা বাস ভাড়া করেই গিয়েছিলাম। এখনকার একটা বৈচিত্র্য এই যে এদেশের চারিধারেই হ্রদ। এখানে ট্রাম, মোটর, বাস ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়া মোটরবোট বা নৌকা করে যে-কোনও স্থানে যাওয়া যেতে পারে।

তখন সেখানে জাভা এবং বালি প্রদর্শনী চলছিল। আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে সেই প্রদর্শনী দেখতে গেছলাম। জাভা ও বালির শিল্পকলা দেখে আমরা সত্যই অবাক হয়ে গিয়েছি। তা ছাড়া বাদ্যযন্ত্র, ঐক্যতান এবং নৃত্য সত্যই অভিনব। গত বৎসর প্যারির বিরাট প্রদর্শনীতেও এদের নৃত্য ও সংগীতে আমরা বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারের যন্ত্রের এরা বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি বটে, কিন্তু বড় বড় কাঁসর ও ঘণ্টাদ্বারা ভাবে ও ছন্দবৈচিত্র্যে এদের নৈপুণ্য ও বিশেষত্ব এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলে যে আমাদেরই নাচতে ইচ্ছা করে। এদের সুরের ভিতর দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের রূপ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় আছে। সাধারণত এরা বেহাগ এবং তিলঙ্গ সুরই বাজায়। (ওরা নিজেরা এ দুই সুরকে কী বলে জানা নেই, তবে আমাদের কানে 'বেহাগ' ও 'তিলঙ্গ'ই শোনায়।) এদের ভিতর, অর্জুন, ভীম,

রাবণ ইত্যাদি মহাভারত ও রামায়ণসুলভ নাম দেখে মনে হয় আমাদের দেশ থেকেই এই নৃত্য ওদের দেশে প্রসারিত হয়েছে। এদের দেশে সকলেই নৃত্যকে সামাজিকতার অঙ্গ মনে করেন—স্ত্রী ও পুরুষ, ধনী ও নির্ধন সকলের মধ্যেই নৃত্যপ্রথা প্রচলিত। এদের রাজ-পরিবারের মেয়েদের মধ্যে অন্যান্য নৃত্যের সঙ্গে গোপিনী নৃত্যের প্রচলন আছে। তাতে শুধু রাজাকে (অন্য কাকেও নয়) শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করে তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে নৃত্য করা হয়। সঙ্ঘ-সংগীত বা 'অর্কেস্ট্রা'র দিক দিয়ে এরা খুবই উন্নতি করেছে। আমেরিকার বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া অর্কেস্ট্রার পরিচালক শ্রীযুক্ত লিপোল্ড স্টকোস্কি (Lepold Stocowski) বালি এবং জাভা পরিভ্রমণের পর এদের 'অর্কেস্ট্রা' প্রসঙ্গে বলেছিলেন— 'এত সুন্দর 'সিমফনিক অর্কেস্ট্রা' পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা তাঁর জানা নেই।' প্যারিতে আমাদের সঙ্গে এদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—এরা অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। এরা ইতিপূর্বে কখনও ইউরোপে আসেনি অথবা এখানকার নৃত্য বা সংগীতের সঙ্গে এদের পরিচয়ও নেই—তথাপি এদের নৃত্য ও সংগীতে ইউরোপ মুগ্ধ। এরা প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছে—তাই প্রতীচ্যে এদের এত আদর।

এই সময়ে হেগ শহরেও বালি প্রদর্শনী চলছিল—সেখানকার বিশেষত্ব এই যে, প্রদর্শনীর ঘরবাড়ি আসবাবপত্র যা কিছু সমস্তই বালির অনুকরণে তৈয়ারি; যেন বালি দেশটাই তুলে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত প্রদর্শনীতে যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত জেসল মিস্টকস্কি (Czeslaw Mystkowski) জন্মস্থান পোল্যান্ড দেশে। ইনি জাভার একটি মেয়েকে বিবাহ করেছেন; কাজেই জাভা এবং বালিকে কেন্দ্র করে ইনি প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, গীতবাদ্য প্রভৃতির বিশেষ অনুরাগী। আমস্টার্ডামে এঁর সঙ্গে ওরিয়েন্টাল

মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম—এখানকার সংরক্ষিত দ্রব্যাদির মধ্যে জাভা ও বালির প্রাধান্যই বেশি তবে অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সংগ্রহও বিস্তর আছে। এখানে ভারতবর্ষেরও নানা প্রদেশের ছবি ও শিল্প-নিদর্শন আছে। উক্ত পোলিস চিত্রকরের অঙ্কিতও অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখলাম। এ সমস্ত প্রধানত জাভা, বালি ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। তা ছাড়া ডাচ ইন্ডিস-এর চারুশিল্পের যা নমুনা দেখলাম তাও অনির্বচনীয়।

২৯শে মে আমরা আমস্টার্ডাম ছেড়ে ডেনমার্কের উদ্দেশে যাত্রা করলেম। এই কয়েকদিনেই এদেশে অনেক বন্ধু ও বান্ধবী জুটেছিলেন, তাঁদের বিদায়-অভিনন্দন এবং রুমাল আন্দোলনের মধ্যে ট্রেন আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে রওনা হল। সুইডেন এবং নরওয়ে দেখবার সাধ যে কতদিনের তা বলা যায় না; এতদিনে সেই সাধ পূর্ণ হতে চলল! হামবার্গে আমাদের গাড়ি বদল করবার কথা, সেখানে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তার মধ্যেই আমাদের আটটি ক্যামেরার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ফিল্ম ক্রয় করলেম। আমরা রাত্রি এগারোটার সময় 'ইস্টসি'-র Warnemunde স্টেশনে এসে পৌঁছালেম। আমরা সকলেই জেগে ছিলেম কারণ এবারের ট্রেন-যাত্রার একটা অভিনব আকর্ষণ ছিল, এখান থেকে সমস্ত ট্রেনখানাই গিয়ে সোজা জাহাজের উপর উঠবে। আমরা তো সবাই জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করলেম—তবে দুঃখ এই যে, রাত্রির অন্ধকারে ফটো নেবার সুবিধা হল না। যাই হোক স-যাত্রী সমস্ত ট্রেনটাই নির্বিবাদে সোজা জাহাজে উঠে এল। আমরা ট্রেন থেকে নেমে জাহাজের ডেকে এসে হাজির হলাম। কিন্তু রাত্রিকাল এবং ভীষণ কুয়াশা আমাদের সমস্ত আনন্দটুকু হরণ করে নিল। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে জার্মান উপকূলের ধূম্র-স্তিমিত-নিষ্প্রভ আলোকমালা ক্রমবিবর্ধমান ব্যবধানের মধ্যে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

জাহাজের এঞ্জিনের বিকট গর্জন কুজ্ঝটিকার বিপদ নিবারক অবিশ্রান্ত তীব্র বংশীধ্বনিতে শ্রবণপটহ বিদীর্ণ হবার উপক্রম হল। এই বিচিত্র শব্দের মধ্যেও আমরা নিজ নিজ কামরায় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিলেম। সকালে উদয়শঙ্করের ডাকে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হল। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। আলো-ছায়ার সন্ধিক্ষণে প্রকৃতিদেবী যেন রক্তরাগ-অলক্ত-রঞ্জিত চরণ বাড়িয়ে আমাদের নূতন দেশে অভ্যর্থনা করে নিতে এসেছেন। মনে হল গতরাত্রে কুয়াশার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আমাদের আনন্দটুকু হরণ করার জন্য আজ ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যে সুশোভিতা হয়ে দেখা দিয়েছেন। দিকচক্রবালের সীমারেখা পর্যন্ত সমগ্র আকাশ তাঁর রক্তাম্বর বেষ্টিত চঞ্চল তনুলাবণ্যে হিল্লোলিত ও সমুদ্ভাসিত। সুদূর-প্রসারিত বেলাভূমিসংলগ্ন বনভূমির স্নিগ্ধশ্যাম নয়নাভিরাম অপূর্ব দৃশ্যে অমর কবি কালিদাসের সেই শ্লোকটি বার বার মনে পড়তে লাগল—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—তমাল তালীবনরাজি নীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা "

আকাশের এই রঙের খেলা প্রতিমুহূর্তেই নব নব রূপে প্রতিভাত হতে লাগল। আমরা বিমূঢ় মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এই অপরূপ হোরী খেলা দেখতে লাগলাম। প্রকৃতির সেই প্রতিবিম্বিত রক্তরাগ স্তব্ধ গম্ভীর নীলাম্বুধিকেও সহসা যেন চঞ্চলতায় অধীর করে তুললে; মনে হল রত্নাকর তার সহস্র সহস্র ঊর্মিবাহু বিস্তার করে রক্তালোকস্নাতা ঊষার নভঃ প্রসারিত জলধিচুম্বিত চঞ্চল রক্তাঞ্চলপ্রান্ত আকর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছেন। চলচ্চিত্রের দৃশ্য পরিবর্তনের ন্যায় এই আলো ও রঙের রূপ ক্ষণে ক্ষণেই পরিবর্তিত হতে লাগল। এইভাবে আমরা কতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে আকাশের দিকে চেয়েছিলাম জানি না—হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়াতে দেখলাম তখন রাত্রি

২-৩০। আড়াইটে!—একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ঘড়ির সঠিক সময় নিরূপণ সম্বন্ধে সংশয় হল, পরে জানলুম এখানে এই সময়েই অর্থাৎ রাত্রি (?) দুটার সময়ই নিত্য ভোর হয়! কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্!—কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ট্রেন জাহাজ থেকে নেমে ভূমিতে চক্রার্পণ করলে। কিছুদূর যাবার পরে ট্রেনখানি আর একবার ওইভাবে আমাদের সকলকে নিয়ে জাহাজে উঠেছিল—এবার আর বেশিক্ষণ নয়, মাত্র এক ঘণ্টার জন্য।

আমরা ৩০শে মে সকাল ছ'টার সময় ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে এসে উপস্থিত হলাম। বলা বাহুল্য অন্যান্য দেশের মতো বহু সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এবং ফটোগ্রাফার স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন—প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ শুরু করে দিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা নানাপ্রকার আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় প্রশ্নে আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা করতে লাগলেন। অবশ্য সকলকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের ব্যবসা, কাজেই সেদিক দিয়ে যাতে ত্রুটি না হয়—তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল। এঁদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যখন হোটেলে উপস্থিত হলাম তখন বেলা আটটা বেজে গেছে। সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজার এসে সুখবর দিয়ে গেলেন বেলা দু'টার সময় ওদেশের প্রধান প্রধান জার্নালিস্টরা দেখা করতে আসবেন। যথাসময়ে তাঁরা এসে তাঁদের নানাবিধ প্রশ্নে ও সদালাপে আমাদের আপ্যায়িত করে সম্ভবত পরিতুষ্ট হয়েই প্রস্থান করলেন। এই সমস্ত প্রশ্নোত্তর সাধারণত ইংরাজি জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই হয়ে থাকে, আলাপের নমুনা গতবারেই পাঠিয়েছি। এই শহরটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং এখানকার অধিবাসীবৃন্দও খুব সরল এবং অতিথিপরায়ণ। তবে সর্বত্র যা ঘটে এখানেও তাই; রাস্তায় বেরুলেই অসংখ্য লোক আমাদের অনুসরণ করে এবং অধিকাংশ স্থলেই অভিবাদনান্তে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করতে শুরু করে। কনকলতা চৌধুরী এবং অমলা নন্দীর (শ্রীমতী অপরাজিতা) পরিধানের অদৃষ্টপূর্ব শাড়িই

সম্ভবত তাদের এই অত্যধিক কৌতূহলের কারণ।

এখানে আমাদের দু'দিন 'নৃত্যাভিনয়' ছিল রয়্যাল থিয়েটারে। প্যারির 'সাঁজ এলিজ' থিয়েটার বুদাপেস্টের অপেরা হাউস-এর মতো এখানেও সুদ্ধ প্রথম শ্রেণীর কলাকৃষ্টি ব্যতীত অপর কোনও সম্প্রদায়কে উক্ত রঙ্গপীঠে অভিনয় করতে দেওয়া হয় না। এদিক দিয়ে আমাদের সৌভাগ্য একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছিল। কারণ, উক্ত রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনও নর্তক বা নর্তকী তার পাদপ্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশের অধিকারী বিবেচিত হয়নি—এমনকী পরলোকগতা বিশ্ববন্দিতা নর্তকীকুলরাজ্ঞী আনা পাভলোভাও এই রঙ্গালয় ব্যবহার করবার অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন—। তিনি বাধ্য হয়ে এখানে অন্য একটি রঙ্গমঞ্চে তাঁর নৃত্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করে গেছলেন।

যথাসময়ে আমাদের অভিনয় শুরু হল, প্রেক্ষাগারে তিলধারণের স্থান ছিল না। এখানকার রাজা, রাজপুত্র, রাজপিতৃব্য প্রমুখ রাজপরিবারস্থ সকলেই—গ্রিসের রাজা এবং শহরের বিশিষ্ট অধিবাসীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়-শেষে রাজার পার্শ্বচর এসে রাজার পক্ষ থেকে উদয়শঙ্করকে অনেক ধন্যবাদ এবং সুখ্যাতি করলেন এবং পরের বৎসরে পুনরায় আসবার জন্য অনুরোধও জানিয়ে গেলেন। এই রঙ্গালয়ের আর একটি অদ্ভুত নিয়ম, দর্শকবৃন্দ যতই আনন্দধ্বনি করতালি বা পুনরাহ্বান (Encore) করুন—যবনিকা দ্বিতীয়বার উত্তোলন করা হবে না। দেবেন্দ্রশঙ্করের ব্যাধ-নৃত্য এবং উদয়শঙ্করের শিবতাণ্ডবের পর দর্শকবৃন্দের পনেরো-কুড়ি মিনিট ব্যাপী করতালি, ভূমিতে পদাঘাত ধ্বনি এবং চিৎকারে মনে হল থিয়েটারটি বুঝি এখনি ভেঙে পড়বে। একজন ডিরেক্টর ছুটে এসে আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাতে লাগলেন—যেন আমরা পুনরায় যবনিকা তোলবার আদেশ না দিই—রঙ্গালয় রসাতলে গেলেও ক্ষতি

নেই কিন্তু কিছুতেই যেন গতানুগতিক নিয়মবহির্ভূত কোনও কাজ না হয়। এখানে আর একটি উপভোগ্য বিষয়—প্রেস রিপোর্টারদের নেওয়া নাচের পেনসিল স্কেচ। কারণ তাদের প্রত্যেক খবরাখবরের সঙ্গে ছবিও থাকা চাই। আমাদের নাচের সময় দু'পাশের উইংস থেকে অনেকেই ওই রকম নাচের ছবি আঁকছিলেন—সেগুলি পরে কাগজেও বেরিয়েছিল—কতকগুলি সত্যই ভারী চমৎকার এবং উপভোগ্য হয়েছিল।

সাধারণত এই সমস্ত 'স্কেচ'-এর ভিতর হাস্যকর উপাদানও যোগ করে দেওয়া হয়ে থাকে—তার ফলে পাবলিসিটির দিক দিয়ে খুবই সুবিধা হয়। এখানে আমরা যেখানেই বেড়াতে গিয়েছি বা যে-কোনও দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছি সকলেই আমাদের নাম ধরে ডেকে অভ্যর্থনা করেছেন—এমনকী এদেশ ত্যাগ করবার সময় স্টিমার স্টেশনের কর্মচারীরাও উদয়শঙ্করের নাম ধরে ডেকে অভিবাদন জানিয়ে গিয়েছে। ইউরোপের কাগজে 'কার্টুনের' আদর আছে—আমাদের দেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কয়েকটি কাগজের কথা বাদ দিলে এক "শনিবারের চিঠি" ছাড়া এই জিনিসের আদর ও মর্যাদা অন্য কোনও সাময়িকপত্রে একেবারেই নেই—যা থাকে তা কদর্য নোংরামি! এখানে যে-সকল উচ্চপদস্থ বা মাননীয় ব্যক্তির ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়—তার জন্য ওই সমস্ত মনীষীরা ক্রুদ্ধ হয়ে সম্পাদকের বা উক্ত কাগজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন না কারণ, তা করবার কারণও ঘটে না বা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিদূষণ' বা কাঁটাগাছ বলে) ওগুলোকে একান্ত অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ করেন না। মানহানির মামলাও রুজু করে দেন না কেউ!—বরঞ্চ ভাল 'কার্টুন' হলে খুশি হয়ে সুখ্যাতিই করে থাকেন। পোল্যান্ড-এর কনসল Mr. & Mrs, Cohomiel এবং আমেরিকান কনসল Mr. & Mrs. Spoford তাঁদের মোটরে

এই কয়দিনে আমাদের সমস্ত শহর এবং তদুপকণ্ঠস্থিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ৩রা জুন থিয়েটার রয়েল-এ আমাদের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। ওইদিন সমগ্র ইউরোপে আমাদের সর্বসুদ্ধ দুইশততম অভিনয় সম্পূর্ণ হল। (প্রথম অভিনয় ৩রা মার্চ ১৯৩১ প্যারির সাঁজ এলিজ থিয়েটারে)

৪ঠা জুন আমরা ডেনমার্ক ছেড়ে স্টিমারে সুইডেন অভিমুখে যাত্রা করলুম। তিন ঘণ্টা পরে সুইডেনের মামলো শহরে উপনীত হলুম। এখানেও যথাপূর্বম কাস্টমস অফিসার প্রেস রিপোর্টার ফোটোগ্রাফার প্রভৃতির ব্যূহ ভেদ করে তবে হোটেলে পৌঁছতে হল। 'মালমো' একটি ক্ষুদ্র শহর, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই বিখ্যাত। Lund বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নিকটেই। এখানে আমাদের একটিমাত্র 'নৃত্যাভিনয়' ছিল—অভিনয়ের পরেই একজন কতকগুলি ফুল এবং একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন—পত্রখানি হিন্দিতে লেখা। উদয়শঙ্করের অনেক স্তব-স্তুতির পরে সে-পত্রে লেখা আছে পত্র-লেখক যদিও সুইডেনবাসী কিন্তু তাঁর জন্মস্থান ভারতবর্ষে ইত্যাদি।

পরদিনই আমরা ট্রেনে নরওয়ের রাজধানী 'অসলো'-র উদ্দেশে যাত্রা করলুম। আমাদের অনেকক্ষণ ট্রেনে কাটাতে হয়েছিল—তবে নানা কারণে যাত্রা একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি।

আমাদের গাড়ি অনেকক্ষণ সমুদ্রের এবং বড় বড় হ্রদের ধার দিয়া চলছিল। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের পরম সার্থকতা উপলব্ধি করতে লাগলাম। সুইডেন থেকে কোনও স্কুলের অনেকগুলি মেয়ে অসলোতে বেড়াতে যাচ্ছিল। তাদের চঞ্চল হাস্য-পরিহাস লাস্য এবং সংগীতে সমস্ত গাড়িখানিকে মুখরিত করে রেখেছিল। তারা আমাদের সঙ্গে ভাঙাভাঙা জার্মান ভাষায় আলাপ শুরু করে দিলে। ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই এত বেশি হয়ে পড়ল যে, আমাদের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে অভিনেত্রীসুলভ অঙ্গভঙ্গির

সঙ্গে ধূমপান শুরু করে দিল। সম্ভবত বেশি সিনেমা দেখার ফলে এই নাটকীয় অনুকরণ-স্পৃহা তরলমতি বালিকাদের মনে আপনা থেকেই এসে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছুটে পার্শ্ববর্তী কমপার্টমেন্টে তাদের শিক্ষয়িত্রীরা কী করছেন একবার করে দেখে আসছিল, উদ্দেশ্য তাঁরা পাছে মেয়েদের এই সমস্ত ফ্লার্টিং দেখে ফেলেন।

অসলোতে যখন পৌঁছালাম তখন রাত্রি (?) প্রায় ন'টা, তখনও বেশ রৌদ্র আছে। আবার সেই কাস্টমস অফিসার—রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারের দল অতিক্রম করে—হোটেলে এসে হাজির হলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করতে রাত্রি বারোটা বেজে গেল। সূর্য অস্ত গিয়েছেন কিন্তু তখনও যা আলো রয়েছে—তাতে বই পড়তে পারা যায়। নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর থেকে চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য দেখা যায়। রাত্রি একটার পরই আবার সূর্যোদয় হয় অর্থাৎ মাত্র আড়াই ঘণ্টার জন্য সূর্য অস্তমিত হন। আমরা সমুদ্রের (উপসাগর) ধারে বেড়াতে বেরুলেম। এদেশের একটা সুবিধা গ্রীষ্মকালে রাস্তায় আলো দেবার খরচ বেঁচে যায়।—(শীতকালে সম্ভবত সুদসুদ্ধ আদায় হয়ে যায়।) গ্রীষ্ম-সায়াহ্ন উপভোগ করবার জন্য অনেকেই সমুদ্রতীরে এসেছেন দেখলাম। বর্ণ-বৈচিত্র্যে আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এবং অনেকেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য নানাপ্রকার সাদর সম্ভাষণ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছিলেন। আমরা যখন হোটেলে ফিরলুম তখন বেলা দু'টা বেজে গেছে—অত আলোয় আলোয় ঘুম হয় না, কাজেই মাফলার চোখে জড়িয়ে নিদ্রা দেওয়া গেল।

পরদিন প্রাতর্ভোজনের পর আমরা ইলেকট্রিক ট্রেনে নিকটবর্তী পাহাড় 'Froger Soete Sen'-এ বেড়াতে গেলাম। এই পাহাড়ের উপর থেকে সমস্ত 'অসলো' শহরটি ভারী সুন্দর দেখায়। জঙ্গল পরিবেষ্টিত এই পাহাড়ের উপরে একটি

প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, সেখানে কোনও বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছোট ছোট মেয়ে তাদের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে খেলা করছে দেখলুম। এই সমস্ত শিক্ষয়িত্রীদের স্বভাবও এই সমস্ত বালিকাদেরই মতো—তাঁদের হাতে বেত না থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীরা তাঁদের যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করে। এদের শিক্ষার ভিত্তিই অন্য রকম। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আমরা এইখানেই বসে পড়লাম। ওই সমস্ত মেয়েরা তাদের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্বরে গান আরম্ভ করল। পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত এই কলতান এবং বিশাল জলাশয়ের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গের উছলিত সঙ্গতে সমগ্র বনভূমিতে আনন্দ শিহরনের সাড়া পড়ে গেল যেন! স্নিগ্ধ শীকরসিক্ত মলয়তাড়িত বিরাট মহীরুহ শ্রেণীও যেন পত্রপল্লবের মর্মর রবে তাদের উন্নতশির আন্দোলিত করে এই সংগীতে যোগদান করলে। পর্বতশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত স্বরলহরী সুদূর প্রবাহিত নির্ঝরের কলতান এবং চঞ্চল সমীরণ শিহরিত শ্যামল তরুরাজির মর্মরধ্বনির সঙ্গে তরুণীদলের কলকণ্ঠের সারিগান বিশ্বস্রষ্টার নন্দন-গীতিরূপে আমাদের মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট করে ফেললে! জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি কালিদাসের অমৃতময়ী অমর লেখনীপ্রসূত সেই বাণী—বারবার মনে পড়তে লাগল—

যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্র ভাগান্
দরী মুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং
তান প্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥

সম্মুখে প্রসারিত গগনচুম্বী গিরিশৃঙ্গ সমাধিমগ্ন বিরাট পুরুষের মতো। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে প্রকৃতি ও মনুষ্য-কণ্ঠের সমবেত সংগীত উপভোগ করতে লাগল। মারুত হিল্লোলিত শৈলগাত্রের শষ্পশ্রেণীর মুহুর্মুহু আন্দোলন যেন পর্বতমালার পুলক-রোমাঞ্চ রূপে প্রতীয়মান হতে লাগল।

এখানে আমাদের দু'দিন 'নৃত্যাভিনয়' ছিল। বলা বাহুল্য সমাদরের মাত্রা খুব বেশিই হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে এখানকার রাজা উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষে যথারীতি পার্শ্বচর পাঠিয়ে উদয়শঙ্করের যথেষ্ট স্তুতি ও জয়গান করেছিলেন।

অসলো শহরটি খুবই আধুনিক। এখানকার মেয়েরা নিজেদের প্যারি বা অন্যান্য সভ্যদেশের মহিলা অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠা, স্বাধীনা এবং অগ্রগামিনী মনে করেন। তার নমুনা বিশেষভাবে নজরে পড়ে রাত্রে রাস্তায় বেরুলেই—পথপার্শ্বের বেঞ্চে বা পার্কে নিবেদনের ছড়াছড়িতে। মোটরের ধূলা এবং পথচারীগণের উৎসুক সহাস্য দৃষ্টিতেও তাদের ভ্রূক্ষেপহীন তাচ্ছিল্য (অথবা প্রেম-তন্ময়তা) সত্যই বিস্ময়কর। রাত্রে ডিনারের সময় একটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন—তিনিই নরওয়ের একমাত্র বিমান-পরিচালিকা এমিলি ইয়াট। কথাপ্রসঙ্গে নরওয়ের নারী প্রগতির কথা উঠল। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে 'নারীপ্রগতি' শব্দের আভিধানিক বা যৌগিক অর্থের কথা বাদ দিলে সাধারণত বোঝায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, কলেজে ছেলেদের সঙ্গে বসে ক্লাস করা, সকলের সঙ্গে কথা বলার অধিকার, পথে বাসে ট্রামে অবাধ চলাফেরা—অথবা ওই ধরনের আরও কিছু, কিন্তু এখানে ওই শব্দের অর্থ ঢের বেশি ব্যাপক—অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা, রাজনীতি, ব্যবসায়, ক্রীড়া, উচ্ছৃঙ্খলতা, চৌর্য ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতিতে সমান অধিকার ও স্বাধীনতা বোঝায়। সমাজ বা কোনও লোকের অভিভাবকত্ব তাঁরা একেবারেই স্বীকার করতে চান না। এই প্রসঙ্গে অনেক কথার পর তিনি বললেন, 'প্যারি প্রভৃতি নামজাদা শহরের মেয়েরাও আধুনিকতার দিক দিয়ে আমাদের এই দেশের মেয়েদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে না।' আমাদের মুখে অবিশ্বাসের হাসি দেখে তিনি রাজেন্দ্রকে আহ্বান করলেন, 'বেশ তুমি আমার সঙ্গে বাইরে এসো এবং যে-কোনও

সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও আমি করিয়ে দিচ্ছি; তারপর তোমার যে-কোনও রকম ব্যবহার তাঁরা কী রকম 'স্পোর্টিং-স্পিরিট'-এ নিতে পারেন তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করবে।' এই কথার অর্থ কতকটা এই রকম দাঁড়াল যে, যে-কোনও লোকের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে এই সমস্ত মহিলাদের কোনও রকম আপত্তি থাকে না। দুঃখের বিষয় রাজেন্দ্র এই কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠতে কিছুতেই রাজি হল না, উক্ত মহিলাটির পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এবং আমাদের উৎসাহদান সত্ত্বেও। এই বৈমানিকা মহিলাটি যে, আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করেছিলেন তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে, আমাদের সম্বন্ধে একটা ভাল প্রবন্ধ লেখা। ভবিষ্যতে ইনি লিখবেনও, এবং যদি কখনও সেটা আমাদের নজরে পড়ে তা হলে হয়তো দেখব তাতে রাজেন্দ্রের এই বিতৃষ্ণা (বা সংকোচ) ইউরোপের ভাষায় 'ভীরুতা' ও shyness বলেই উল্লেখ থাকবে—আমরা কিন্তু সেটা রাজেন্দ্রের প্রশংসা বলেই ধরে নেব।

আমরা এখান থেকে সুইডেন, ফিনল্যান্ড লাটেভিয়া, এসথোনিয়া লিথুয়ানিয়া, জার্মানির কয়েকটি শহর এবং পুনরায় চেকোশ্লোভেকিয়া হয়ে প্যারি ফিরে যাব। এই সমস্ত বিবরণ পরের বারে পাঠকদের শোনাতে চেষ্টা করব।

৪

নরওয়ে ত্যাগ করে ৮ই জুন সকালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহলম্ অভিমুখে যাত্রা করি। সেই দিনই সন্ধ্যায় উক্ত শহরে উপস্থিত হই। রেল স্টেশনে একটি ভদ্রলোক আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। পত্রের লেখিকা মাদাম ভেনেক। এই আড়ম্বরশূন্য পত্রবাহক ভদ্রলোকটিই শ্রীযুক্ত ভেনেক—চেকোশ্লোভেকিয়ার 'কনসল'। স্টেশনে 'প্রেস রিপোর্টার' এবং

ফিল্মের গোলমাল চুকে গেলে ইনিই আমাদের হোটেল ইত্যাদি ঠিক করে দিলেন। আমরা মাত্র আড়াই দিন এদেশে ছিলাম—এই ভেনেক-দম্পতী শহরের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে এবং নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে বিশেষভাবেই উপকৃত করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য স্থানের মধ্যে নাগরিকগণের সভাগৃহই (Town Hall) প্রধান। এই মনোরম সভাগৃহ প্রথম দৃষ্টিতে প্রাচীন যুগের বলেই মনে হয়েছিল—কিন্তু পরে জানলাম এর নির্মাণকর্তা এখনও বর্তমান! তিনি হচ্ছেন এ রাজ্যের রাজভ্রাতা। এই সভাভবনের বিভিন্ন কক্ষগাত্রে, প্রাচীরে ও ছত্রতলে রাজভ্রাতার স্বহস্তে অঙ্কিত ও উৎকীর্ণ যে সমস্ত অসংখ্য চিত্রাবলী আছে তা এতই সুন্দর এবং কলাসৃষ্টির দিক দিয়ে এতই অভিনব ও মনোরম যে কেবলমাত্র উচ্চ প্রশংসার দ্বারা তাহার সঠিক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের এই অত্যদ্ভুত পরাকাষ্ঠার নিদর্শন আমাদের সকলকে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছিল। এই সমস্ত মনোমুগ্ধকর বিচিত্র ও বিরাট কারুকার্য যে-কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের। কিন্তু আবাল্য রাজপরিবারের বিলাস-ব্যসনে লালিত এই রাজশিল্পীর অসীম ধৈর্য সাধনা ও শ্রমসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি কারু ও কলা সৃষ্টিক্ষেত্রে তাঁর এই অনন্যসাধারণ রসবোধ সৌন্দর্যানুভূতি সুরুচি ও সংস্কৃতি আমাদের অধিকতর বিমুগ্ধ করেছিল। এই সভাভবনের একটি কক্ষ শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙিন কাচখণ্ড দ্বারা আশ্চর্য উপায়ে নির্মিত। নানাবিধ বিচিত্র সংগ্রহ সমন্বয়ে এই টাউন হলটিকে একটি ‘মিউজিয়ম’ বলা চলে।

সেই দিনই অর্থাৎ ৯ই জুন রাত্রে আমাদের রয়্যাল থিয়েটারে নৃত্যাভিনয় ছিল। কয়েক দিন পূর্বেই আমাদের দু’রাত্রি অভিনয়ের সমস্ত টিকিট নিঃশেষে বিক্রয় হয়ে গেছে শোনা গেল। রাজা এবং রাজপরিবারস্থ সকলেই নাচ দেখবার জন্য সেই রাজকীয় নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রশঙ্করের

কিরাতনৃত্য, উদয়শঙ্করের রাধাকৃষ্ণ এবং শিবনৃত্য বারংবার পুনরাবৃত্তি করেও দর্শকদের অবিরাম করতালি ও পুনরাহ্বান ধ্বনি উচ্চারণ হতে প্রতিনিবৃত্ত করা গেল না। উদয়শঙ্করের অসিনৃত্যের পর রয়্যাল বক্সে বৃদ্ধ রাজাকে ওই ধরনের তরবারী কৌশল অনুকরণ করতে দেখা গেল, পরে তিনি উদয়শঙ্করের অসিচালনা কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। শোনা গেল এখানকার রাজা ইতিপূর্বে আর কখনও কোনও অভিনয়ে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি, কিন্তু আমাদের নৃত্যাভিনয়ে তিনি দু'দিনই শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন।

পরের দিন আমরা এখানকার প্রসিদ্ধ 'জাতীয় উদ্যান' দেখতে গিয়েছিলেম। এ-স্থানের একটা উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য যা লক্ষ করলাম সেটা হচ্ছে এই যে, এখানকার অধিবাসীরা আদিম যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী বজায় রাখবার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ এই উদ্যানের বিভিন্ন দিকে সুইডেনের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের বাস। তাঁরা আধুনিক সভ্যতা ও রুচি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজ নিজ প্রদেশের জাতীয় প্রাচীন পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য সর্বদা যত্নবান। এক প্রদেশের রীতিনীতি ও পরিচ্ছদাদি অন্য প্রদেশ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এতটুকু দেশের মধ্যে এত বেশি পার্থক্য দেখে মনে হল ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে যে-বিভিন্ন প্রাদেশিকতা দৃষ্টিগোচর হয় সে আর এমনকী বেশি! তবে এদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আদর্শ সত্ত্বেও একটা একতাবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রচেষ্টা আছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা অন্তত সপ্তাহে দু'-একবার মিলিত হয়ে শহরের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখেন। এঁদের প্রাচীন প্রথায় নির্মিত বাসভবন ও পর্ণকুটীরগুলি দেখলে মনে হয়—বর্তমান শহর থেকে বহু দূরে কোনও পুরাতন যুগের জনপদে এসে পড়েছি। এই উদ্যানে নানা দেশীয় জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর বিরাট সংগ্রহ আছে। একটি কৃত্রিম

উপসাগর নানাবিধ জলচর পশুপক্ষীতে পূর্ণ। এই উপসাগরের ধারেই একটি প্রকাণ্ড বাড়ির লম্বা ছাদের উপর বড় একটি রেস্তোরাঁ আছে। সেদিনের বৈকালিক চা-পানাদি আমরা এইখানেই সেরে নিলাম। প্রায় দু'শো সুন্দরী তরুণী পরিচারিকা তাদের নানাবর্ণের বিভিন্ন জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে এখানে অতিথিদের পরিচর্যা করে। হাল ফ্যাশানের আধুনিক সভ্য পরিচ্ছদ এই সমস্ত বিচিত্র পোশাকের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

পরের দিন আমরা এই শহরের উপকণ্ঠে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের (প্রসিদ্ধ Thiel Family—বিখ্যাত Thiel Museum এই পরিবারেরই সম্পত্তি) সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেম। এখানে অনেক জ্ঞানীগুণী শিল্পী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। আমরা সারাদিন চিরপরিচিতের মতো লম্ফঝম্ফ দৌড়াদৌড়ি ও উচ্চ কোলাহলে এঁদের প্রকাণ্ড উদ্যানটিকে মুখরিত করে রেখেছিলাম। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে ভেনেক-দম্পতী এবং আরও অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া ভ্রমণ আমাদের এইখানেই শেষ হল। এদেশের স্মৃতি আমরা জীবনে বিস্মৃত হতে পারব না। প্রাকৃতিক দৃশ্যবৈচিত্র্যে, কি স্থলে—কি জলে—কি আকাশে এমন সুরম্য ভূমি আর কোথাও আমাদের নজরে পড়েনি। এ-বিষয়ে সুইজারল্যান্ড এবং ইটালির খ্যাতি অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের চোখে এই উত্তর ইউরোপের প্রান্তিক উপদ্বীপটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হল। ইউরোপের আকাশ অধিকাংশ সময়েই ধূম্রাচ্ছন্ন ও কুহেলিকাবৃত থাকে—কিন্তু এদেশের আকাশের মতো মনোরম শোভা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিনি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর চির নূতন বসন্তের গানে গেয়েছেন—

'হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ,
হাসির আঘাতে তার, মৌন রহে না আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে.ক্ষণে...'

এখানে কবি বসন্তের আকাশকে ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্যের প্রতীক বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে—? উচ্ছল চঞ্চল বহু বর্ণচ্ছটাবিভাসিত বিচিত্র আকাশ যেন পুষ্পধনুর মতো ধ্যানমগ্না তাপসীরূপিণী পর্বতমাল্য পরিশোভিতা ধরিত্রীর তপোভঙ্গ করতেই ব্যস্ত। এখানকার অসংখ্য রঙের লুকোচুরি খেলার বর্ণনা অসম্ভব—আমরা শুধু মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকতেম।

সুইডেনের রাজাকে ইউরোপের আদর্শ নরপতি বলা যায়। রাজ-পরিবার বা রাজপুত্রের জন্য কোনও পৃথক বিদ্যালয় নেই বা তাদের শিক্ষার জন্য কোনও বিশেষ রাজোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। সকলের সঙ্গে সাধারণভাবেই রাজ-পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও স্কুল বা কলেজ যেতে হয়। অঙ্কন বিদ্যায় বা স্থাপত্য শিল্পে রাজভ্রাতার মতো পারদর্শী শিল্পী অন্য কোনও দেশে বর্তমানে আছেন কি না সন্দেহ। তাঁর হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য স্বচক্ষে না দেখলে সম্যক উপলব্ধি হয় না।

এখান থেকে আমরা ফিনল্যান্ড (Finland) বা হাজার হ্রদের দেশে রওনা হলাম। নানা প্রকার দৃশ্যবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলে পরের দিন আমরা এদেশের রাজধানী Helsingfors-এ উপস্থিত হলাম। দেশটা বিশেষ বড় নয় তথাপি এখানে আমাদের পাঁচ দিন নৃত্যাভিনয় করতে হয়েছিল। এদেশে যাবার পথে Rewal-এ নৃত্য প্রদর্শনের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ এত টাকা বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে নারাজ হওয়াতে সেখানে নাচের আসর না দিয়েই প্রস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেম।

এর পরে আমরা ল্যাটভিয়ার (Latvia) রাজধানী রিগাতে

নৃত্য প্রদর্শন করি। এই শহরে আসতে হলে তিন ঘণ্টা স্টিমারে পরে ট্রেনে যেতে হয়। এই সামান্য জলপথটুকু কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। জলপথের দু'ধারে এবং জলের মধ্যে অসংখ্য পাহাড়। সেদিন আবার কুয়াশায় সবদিক আচ্ছন্ন ছিল। আমরা তো কোনও রকমে নিরাপদে পৌঁছেছিলাম। কিন্তু খবর পেলাম—ওই স্টিমারই পরের দিন ওই পথে চড়ায় আটকে পড়েছিল।

এখানকার পালা সাঙ্গ করে আমরা ২১শে জুন 'কভনো'-তে (Kovno বা Kaunas) এলাম। 'কভনো' লিথুয়ানিয়ার রাজধানী। ইউরোপের একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক দেশের রাজধানী যে এত অপরিচ্ছন্ন হতে পারে তা আমরা পূর্বে কল্পনা করতেই পারিনি। এদেশে পাথরের রাস্তা এক শত বৎসরের মধ্যে মেরামত হয়েছে বলে মনে হল না। এখানে ট্রাম বা মোটরবাস নাই। আছে শুধু 'ট্যাক্সি' আর বেলুন-টায়ার সংযুক্ত ঘোড়ার গাড়ি। এই বেলুন-টায়ার গাড়িগুলি কিন্তু ঘোড়া বা আরোহী কার যে সুবিধার জন্য তৈরি হয়েছিল তা এ দেশের রাস্তার গুণে ঠিক বোঝা গেল না। একটি ছোট ট্রেন শহর প্রদক্ষিণ করে ঘুরে বেড়ায়। তাও এত ছোট যে মনে হয় ধাক্কা লাগলেই উলটে যাবে। এখানকার সমস্ত জিনিসেরই ভীষণ চড়া দাম। হোটেলের চার্জও ইউরোপের অন্যান্য শহরের ভাল হোটেলের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু হোটেলের ভিতরে দুর্গন্ধে থাকা কঠিন। এই হোটেলটি এখানকার প্রেসিডেন্টের বাড়ির ঠিক সম্মুখে, কাজেই প্রধান বলা যেতে পারে। ঘরে শুধু কম্বল ও বালিশ। বিছানার চাদরের খোঁজ করাতে জবাব পেলাম—আপাতত সেগুলি রজকালয়ে আছে। এখানে 'সামার' থিয়েটারে আমাদের অভিনয় ছিল। নামটি বেশ—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—অভিনয় বটে। আমাদের দেশে শখের যাত্রা বা থিয়েটারের আটচালার মতো কতকটা। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছিলেন বৃষ্টি হলে দর্শকের দর্শন দুরূহ হবে। সৌভাগ্যবশত আমাদের দু'দিনের আসরে—এক দিনও বৃষ্টি

হয়নি, কাজেই এখানকার পালাও নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছিল। এর পরে আমরা উত্তর জার্মানির কয়েকটি শহরে নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করি—যথা—Bad-Elster, Bad-Kissengen, Mainz, Wild-bad, Wiess-baden, Bad-Kreuznach, Werzburg, Baden Baden, Baden-wielder, Villingen, Reiehen hall, Munchen এবং Phorzine। পরে অস্ট্রিয়ায় Bad-Ischl, Salzburg প্রভৃতি। এতগুলি 'Bad' (ব্যাড) যুক্ত শহরের নাম দেখে কেউ যেন মনে না করে বসেন এগুলি সত্যই খারাপ শহর! জার্মানিতে 'Bad' শব্দের অর্থ 'Bath' অর্থাৎ স্নান। এই সমস্ত দেশে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ আছে—সেই জন্য গ্রীষ্মের সময় দেশ-দেশান্তর হতে এখানে বহু লোক সমাগম হয়। তাঁরা শুধু এই উষ্ণ জলের প্রস্রবণে স্নান এবং ওই জল পান করবার জন্য আসেন। এখানে সকলেরই বিশ্বাস এই জল পান করলে যে-কোনও প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়। আমাদের দেশেও অনেক তীর্থস্থানে এই প্রকার বহু 'কুণ্ড' আছে এবং সেগুলিরও এবংবিধ মাহাত্ম্যের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এই সব প্রস্রবণের ধারেই জল পান করবার জন্য কাচের গ্লাস ভাড়া পাওয়া যায়। তা ছাড়া অনেকের 'প্রাইভেট গ্লাস'-ও জলওয়ালাদের কাছে রাখা থাকে। সে-গ্লাস মালিক ভিন্ন অপর কেউ ব্যবহার করতে পায় না।

অস্ট্রিয়ার সালজবুর্গ (Salzburg)-এর মতো সর্বাঙ্গসুন্দর শহর আমরা খুব কমই দেখেছি। চতুর্দিকে পাহাড়ের আবেষ্টনীর মধ্যে শহরটিকে দেখে মনে হয় যেন পাহাড় কেটে এই সুন্দর শহরটি নির্মিত হয়েছে। এই দেশেই, এই মনোরম পারিপার্শ্বিক নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যবৈচিত্র্যের মধ্যেই অমর সংগীতনায়ক মোজার্ট (Mozart)-এর জন্ম। পুরাতন রাজপ্রাসাদ পাহাড়ের উপরেই অবস্থিত। তা ছাড়া সেখানে একটি গ্রামও আছে। প্রাচীন কারুশিল্পে এবং নানাবিধ দুর্লভ দ্রব্য-সংগ্রহ সমন্বয়ে এই রাজপ্রাসাটি বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত

হয়েছে। এখানে থেকে শহরের দৃশ্যও অতি মনোরম। প্রাসাদে একটি অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রে সকালে ও সন্ধ্যায় সাতশো খ্রিস্টাব্দের প্রাচীন সংগীত ধ্বনিত হয়। এখানে পুরাকালের কয়েদিদের ঘর,—তাদের উপর নির্মম উৎপীড়নের নমুনা, রাজাদের বিলাসিতার নিদর্শন ইত্যাদি অতীতের বহু স্মৃতি এখনও বর্তমান। এখানে 'Festpiel Haus'-এ (Reinhert Theatre) আমাদের অভিনয় ছিল। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ও অভিনেতা Max Reinhart এই মনোরম নাট্যপীঠের নির্মাতা। ইউরোপের সর্বত্রই আমরা সেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় করেছি। কিন্তু এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সুষ্ঠু রঙ্গালয় আমরা এই প্রথম দেখলাম। ইহার নির্মাতা Max Reinhart যৌবনে দরিদ্র ছিলেন। তিনি প্রকৃত শিল্পী। শিল্পীর সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার এবং অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ রেখেই এই বিরাট গৃহটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখানকার পারিপার্শ্বিক আবহের মধ্যে উৎসাহের প্রেরণা আপনা থেকেই জেগে উঠে। এরূপ রঙ্গালয়ে কৃতিত্ব দেখানো যে-কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নেই। এখানে আমাদের শেষ অভিনয় হয় ১৭ই জুলাই। আমরা ১৮ই তারিখে প্যারি অভিমুখে রওনা হলাম।

আপাতত ইংল্যান্ড বাদে (সেখানে আমাদের পরে যাওয়া হয়েছিল। সে-খবর ভবিষ্যতে জানাবার ইচ্ছা আছে) সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ এইখানেই আমাদের শেষ হল। অন্যান্য বহু স্থানে নৃত্যাভিনয়ের নিমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও এত শীঘ্র প্যারিতে প্রত্যাবর্তনের কারণ—আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সমালোচকবর্গ এবং আমেরিকান 'শো' ম্যানেজার (Impresario) প্যারিতে আমাদের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। এই সমস্ত সমালোচক চূড়ামণিদের অনুকূল সমালোচনার উপরই আমাদের আমেরিকায় যাওয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। ১৯৩১ সালে আমাদের আমেরিকার যাওয়া একরকম স্থির ছিল—কিন্তু তৎপূর্বে যে ভারতীয়

অভিনেতৃদলকে এঁরা নিয়ে যান তাঁদের শোচনীয় ব্যর্থতাই আমাদের পূর্ববারের চুক্তিভঙ্গের কারণ। তা ছাড়া, ভবিষ্যতে আর কোনও ভারতীয় দলকেই আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হবে না এই রকম একটা কঠিন পণ করেছিলেন সেদেশের প্রমোদনায়কেরা। কিন্তু ইউরোপে আমাদের সফলতায় এঁদের সংকল্পের পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের 'ইমপ্রেসারিয়ো' মিঃ হুরোক নিজ স্কন্ধে এ-দায়িত্ব না রেখে নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ নৃত্য ও সংগীত সমালোচগণকে নিজব্যয়ে প্যারিতে আনিয়ে তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। লেখা বাহুল্য, পরে তাঁদের উচ্ছ্বসিত সমালোচনা নিউইয়র্কের পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে আগামী ডিসেম্বরে আমাদেরও ভূগোলের অপর গোলার্ধে যাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। ইতোমধ্যে আমরা আর একবার ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলাম। এই সমস্ত সফরের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে, গোটাকয়েক প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখমাত্র করে ইউরোপের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের উপর আপাতত যবনিকাপাত করতে ইচ্ছা করি।

এই ব্যাপারটি ঘটেছিল চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ (Prague) শহরে। বুদাপেস্ট থেকে মোটরবাসে যাচ্ছি। সীমান্তের রক্ষী সৈন্যগণ 'বাস' আটক করলে। তখন সন্ধ্যা। পরের দিন সায়াহ্ন ছ'টায় প্রাগ্-এ আমাদের অভিনয়। কাজেই এখানে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলে না। অথচ এরাও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটক রাখতে চায়। অনেক অনুনয় বিনয়—শেষে উর্ধ্বতম কর্ম্মচারীর সঙ্গে বন্ধুত্বের উল্লেখ করে ভয় প্রদর্শন, কিছুতেই ফল হল না। টেলিফোন পর্যন্ত ব্যবহার করবার অনুমতি পেলুম না। নিরুপায় হয়ে পাঁচ মাইল দূরে এদের 'অফিসার'-এর বাড়ি গেলাম। তিনি তখন নিদ্রামগ্ন। তবু ডাকাডাকি করে তো তাঁকে তুললাম। সদ্যজাগ্রত স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উঠেছিলেন। এভাবে আশ্রম-পীড়া দেওয়ার জন্য খুবই

সংকুচিত হলাম, কিন্তু উপায় নেই। আমাদের দুঃখের কাহিনী এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব জ্বলন্তভাষায় বর্ণনা করবার পরও তাঁর নির্বিকার নিদ্রাস্তিমিত চক্ষু দেখে বিশেষ ভরসা পেলাম না। তথাপি, আমাদের যাবার অনুমতি তাঁকে দিতে হল, কারণ তাঁর গুণবতী স্ত্রী আমাদের হয়ে তাঁকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। যাই হোক, পরের দিন 'প্রাগ'-এ পৌঁছতে আমাদের রাত্রি সাড়ে ন'টা বেজে গেছল। অর্থাৎ অভিনয় আরম্ভ হবার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে আমরা থিয়েটারে গিয়ে নামলুম। বহু পূর্ব হতেই সমস্ত 'হাউস' বিক্রয় হয়ে গেছে খবর পেয়েছিলাম। দূর থেকে থিয়েটারের সম্মুখে অসম্ভব ভিড় দেখে বিরুদ্ধ জনতা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মোটরবাসের আলো নিভিয়ে পিছনের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের ম্যানেজার তো উন্মত্তের মতো এসে বললেন 'শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে সকলে বসে আছেন।' আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি আমাদের অভিনয় আরম্ভ করে দিতে বললেন। কিন্তু সাজ-সজ্জার দরুনও সকলের একটু বিলম্ব হবেই, কাজেই আমাকেই সর্বাগ্রে 'স্বরোদ' নিয়ে সেই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন হতে হল! তাড়াতাড়িতে ক্ষৌর কার্যের পর্যন্ত সময় পেলাম না। আরম্ভের পূর্বে ম্যানেজার আমাদের বিলম্বের কারণ সবিস্তারে সবাইকে জানিয়ে দিলেন বটে; তবু, সেই সুদীর্ঘ অপেক্ষায় উত্ত্যক্ত দর্শক মণ্ডলীর কাছে যে কী ব্যবহার পাব সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা রইল। যবনিকা উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই বিকট কোলাহল এবং করতালি শুরু হল—সে আর থামতেই চায় না। মনে হল—এই বুঝি দেরি হওয়ার দরুন প্রতিশোধ নিতে এরা ক্ষেপে গিয়েছে। প্রথমেই আমাকে হাতে পেয়েছে—কী যে করবে কে জানে? যা থাকে কপালে—চোখ বুজে বাজনা তো আরম্ভ করে দিলুম। কোনও দিকে না চেয়ে একমনে বসে বাজনা শেষ করলুম। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কানে এল সেই উন্মত্ত কোলাহল

এবং স্টেজে 'ধুপ্-ধাপ্' করে কী সব ঠিকরে এসে পড়তে লাগল। দর্শকেরা কী যেন ছুড়ে মারছে!—উঠে পালাব কি না ভাবছি—একটা গায়ে এসে পড়াতে দেখলাম, সেগুলি ইট পাটকেল বা গলা পনির বা পচা ডিম নয়—ছোট ছোট সুন্দর ফুলের তোড়া!—তখন বুঝলাম—এই কোলাহল আনন্দ পরিতৃপ্ত অনুরাগের,—হতাশা-ক্ষিপ্ত বিরাগের নয়। এই আনন্দধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আমাদের 'নৃত্যাভিনয়' শেষ করতে রাত্রি একটা বেজে গেল। শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অনুরাগীবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণে বিদায় করতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। পরের দিন দেখা গেল স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে সীমান্ত-রক্ষীদের অযথা অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য এবং আমাদের জনপ্রিয়তার বিষয়ে বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একটি কাগজ মন্তব্য করেছেন—একটা কোনও 'শো' দেখবার জন্য দর্শকবৃন্দের এরূপ সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা শান্তভাবে অপেক্ষা করা ইউরোপে এই প্রথম। অর্থাৎ অন্য যে-কোনও ব্যাপারে দর্শকেরা টিকিটের মূল্য ফেরত নিয়ে চলে যেতেন। অথচ আশ্চর্য যে এই 'শো'-তে একজন লোকও টিকিটের মূল্য ফেরত চাননি। ও দেশের সংবাদপত্রের মতে এই ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অভিনব—এবং উদয়শঙ্করের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘ্য।

বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুশেল্স-এর একটি ঘটনা নানা কারণে এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। ওখানে ব্রিটিশ পরিচালিত একটি ভাল হোটেল আছে। উদয়শঙ্কর সাধারণত হোটেলের ভাল ঘরগুলিই ভাড়া করেন। এ ক্ষেত্রে এরা আপত্তি করে যে, ভারতীয়দের নীচের ঘরে থাকতে হবে। উদয়শঙ্কর বললেন, আমরা যেখানেই গিয়াছি সম্মানের সহিত ভাল ঘরেই থেকেছি—এ-ধরনের কথা কোথাও এ পর্যন্ত শুনিনি। এর উত্তরে ব্রিটিশ হোটেলওয়ালা বললেন—'আমরা যে ব্রিটিশ! তোমরা সব দেশেই সম্মান পেতে পার, কিন্তু—আমাদের কাছে

সে-আশা করতে পার না—ইত্যাদি।' এই নিয়ে বাধল তুমুল ঝগড়া। আমরা সদলে জবরদস্তি ঘর দখল করলাম। ব্রিটিশ ম্যানেজার পুলিশ ডাকলেন। আমরাও ফোন করে তাদের বড় কর্তাকে আনালাম। তিনি এসে ব্রিটিশ পুঙ্গবকে যা বলেন তার সারমর্ম্ম হচ্ছে, 'আজ যে বিখ্যাত শিল্পী ও গুণীকে দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে বড়লোক এই শহরে এসে ভিড় করেছেন, তাঁকে তোমরা নির্লজ্জের মতো কোন সাহসে অপমান কর? বর্ণবিদ্বেষ বা প্রভুত্ব তোমাদের নিজেদের দেশে গিয়ে চালিয়ো—এ দেশে ও সমস্ত হীন ব্যবধান চলবে না'। এই বলে তিনি হোটেলের রিজার্ভ করা সব সেরা ঘরগুলি পর্যন্ত নিজ হাতেই আমাদের জন্য খুলে দিলেন। পরে অবশ্য ব্রিটিশ ম্যানেজার তাঁর ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমাদের অন্যান্য সুবিধার বন্দোবস্তের ত্রুটি করেননি।[২] বর্ণবিদ্বেষ অল্প-বিস্তর ইয়োরোপের সব দেশেই আছে। প্যারিতে একটি বড় কাফে আছে; নাম 'লা কুপোল'। সেখানে শুধু আর্টিস্ট এবং বিদেশি লোকেরই বেশি আমদানি এবং সব সময়ে ভিড় লেগেই আছে। এখানে পাঁচশত জন একত্রে ভোজন করতে পারে। একদিন আমরা এখানে সান্ধ্য-ভোজন করছি, একজন নিগ্রো প্রিন্স আহারের পর বলরুমে ঢুকতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয় সম্ভবত তাঁর নিকষ কালো চামড়ার জন্য। নিগ্রো প্রিন্স কিন্তু এই বলে শাসিয়ে গেলেন 'সাত দিনের মধ্যে আমি আবার আসব। তখন কিন্তু তোমরা আমাকে সেলাম করে বলরুমে যেতে দিতে বাধ্য হবে।' প্রিন্স সেইদিনই এই ব্যাপার বর্ণনা করে ফরাসি গভর্নমেন্টকে চিঠি লেখেন—গভর্নমেন্টও তৎক্ষণাৎ ওই কাফেঁতে নোটিশ দিলেন 'আমাদের দেশে আমাদের সঙ্গে অন্য কোনও দেশের লোকের কোনও প্রভেদ নেই। ভবিষ্যতে এ-ধরনের অভিযোগ এলে তোমাদের 'প্রাইভেট্ ক্লাব' হিসাবে লাইসেন্স নিতে হবে।' ফলে, কাফেঁওয়ালারা নিগ্রো প্রিন্সের কাছে আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করে পরের দিন তাঁকে উক্ত কাফেঁর

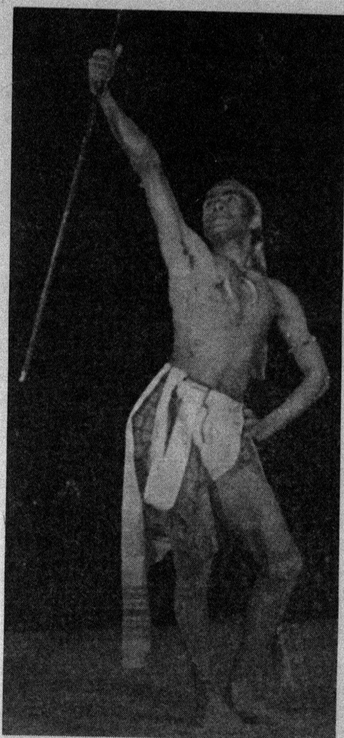
নাচের মজলিশে পুনরায় যাবার জন্য অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলেন।

ইউরোপে সার্ধ বৎসর ভ্রমণে নানারূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমস্ত খবর দেওয়া আপাতত অসম্ভব। পরের বারে আমেরিকায় যাওয়ার খবর সংক্ষেপে জানাবার চেষ্টা করব। ১৯৩১ সালে ৩রা মার্চ প্যারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় 'সাঁজ এলিজ্' থিয়েটারে আমাদের প্রথম অভিনয় হয়। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত—ইংলন্ড বাদে সমগ্র ইউরোপে আমরা চারি শতেরও অধিক নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করেছি।

১। আমি পূর্ববারে মাদাম 'ভেনেক' (Vanek)-এর কথা লিখেছিলাম। ইনি অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের বান্ধবী। আমি তাঁরই পরিচয়পত্রে 'প্রাগ'-এ (চেকোশ্লোভেকিয়া) এই মহিলাটির সহিত পরিচিত হই। মাদাম 'ভেনেক' সেখানকার শিল্পী, সংগীতজ্ঞ ও বিদ্বজ্জন সমাজে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং নানা ভাবে সাহায্য করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করেছেন।

২। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। ভারতের ঘরে-বাইরে এবং পথে-ঘাটে 'ব্রিটিশ' বলে যাঁরা পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁদের ব্যবহারে ইংলন্ডের উপর আমাদের চিরকালই অভক্তি এবং বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু পরে লন্ডনে এবং ইংলন্ডের অন্যান্য শহরে প্রায় এক মাস আমাদের নৃত্যাভিনয় হয়। তার ফলে আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। নিজেদের দেশে এরা সত্যই অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্রলোক। এ সমস্ত বিবরণ পরে জানাবার ইচ্ছা রইল।

ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৯৩৯, পৌষ ১৩৩৯, আষাঢ় ১৩৪০,
অগ্রহায়ণ ১৩৪১



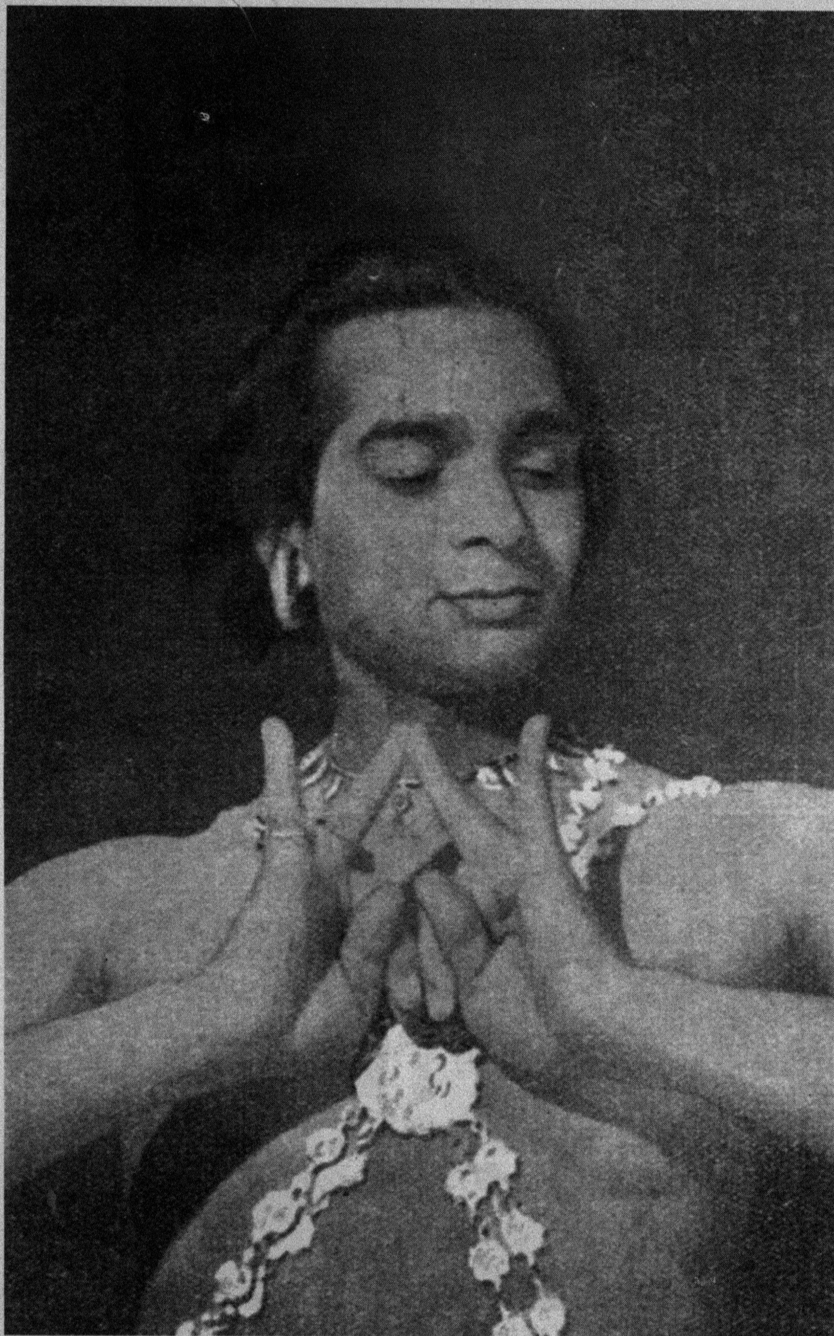
কিরাত-নৃত্য (দেবেন্দ্রশঙ্কর)



'গঙ্গা-পূজা'র একটি দৃশ্যে মীনার নৃত্যভঙ্গি



বাসন্তী-নৃত্য, নটী—শ্রীমতী শিমকী (বাম দিক হইতে—কেদারশঙ্কর, বিষ্ণুদাস, তিমিরবরণ, বেচু, রাজেন, ব্রজবিহারী)



গন্ধর্ব নৃত্যে—উদয়শঙ্কর



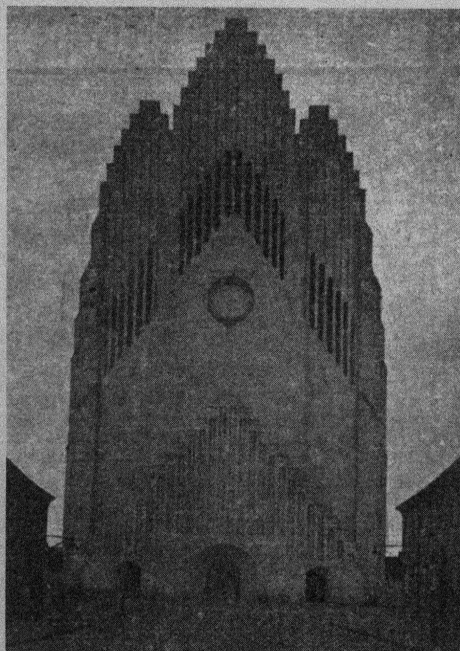
নাচ (মীনা ও শিম্‌কী) উপবিষ্ট (বাম দিক হইতে—কেদারশঙ্কর, বিষ্ণুদাস, তিমিরবরণ, রাজেন ও ব্রজবিহারী)



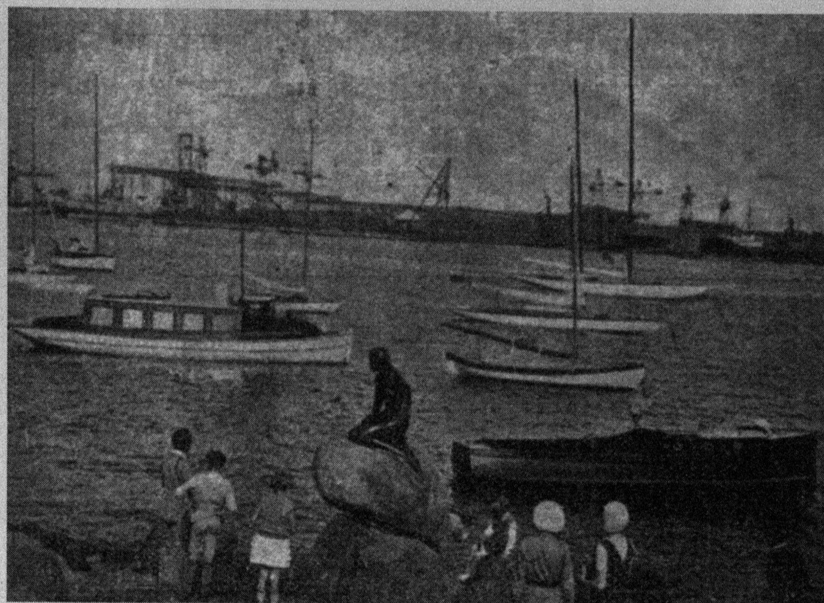
প্রেমনগরের পুরাতন গির্জার নিকটবর্তী গোল্ডেন লেন নামক অপ্রশস্ত রাস্তা। প্রাচীনকালে এই রাস্তায় তখনকার সুবিখ্যাত রসায়নবিদগণ বাস করিতেন। বিদেশিদের এই সকল বাড়িতে যাইবার অধিকার আছে। এই সমস্ত বাড়িতে স্ত্রীলোকেরা বাস করে। বাড়িগুলি প্রাথমিক অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।



কোপেনহেগেন—সুবিখ্যাত উৎসের সম্মুখভাগ। (বাম দিক হইতে—বেচু, রাজেন, সিরালী, কেদার চৌধুরী, অমলা, উদয়শঙ্কর, শিমকী, কনকলতা, দেবেন্দ্র, তিমিরবরণ, ব্রজবিহারী)



বিচিত্র গির্জা



কোপেনহেগেন—সমুদ্রতীরে (ছবি—তিমিরবরণ)



তিমিরবরণ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুদাস সিরালী
(রাজেন্দ্র গৃহীত ছবি)



আমেরিকান এজেন্ট মি. এস, হরক। দক্ষিণে অপরাজিতা (অমলা), বামে কনকলতা (ছবি—উদয়শঙ্কর)



আমস্টার্ডামে। পোল্যান্ডের বিখ্যাত চিত্রকর মি. Czeslaw Mystkowski ও তাঁহার জাভানিজ পত্নী ভারতীয় নর্তক দলকে তাঁহাদের চিত্রপ্রদর্শনী দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন। এইখানে জাভা ও বালি দ্বীপ হইতে সংগৃহীত চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই মিউজিয়মে ভারতীয় নর্তকদল ওলন্দাজদিগের অধিকৃত ইন্ডিজ দ্বীপাবলী হইতে আনীত বাদ্যযন্ত্রাদি ও কলাশিল্প-নিদর্শন প্রভৃতি দর্শন করেন। ইহা হইতে জাভানীজ ও ভারতীয় সভ্যতার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষিত হয় (ছবি—রাজেন্দ্র)



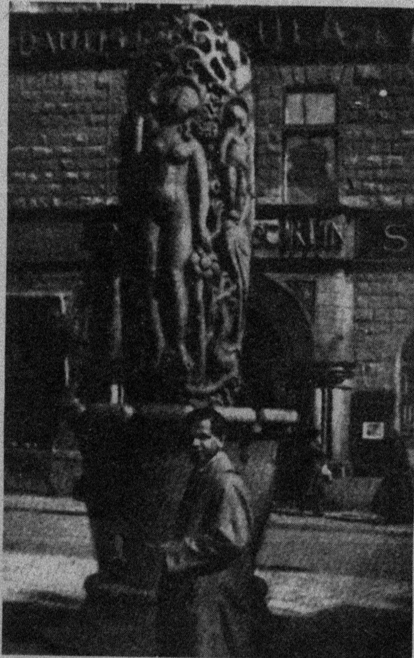
একটি দুর্ঘটনা। ভারতীয় নর্তকদলের গাড়ির ধাক্কা খাইয়া একটি সুবৃহৎ বাস উলটাইয়া পড়িয়াছে। বাসখানি খালি ছিল। কেহ আঘাত পায় নাই। ভারতীয়দিগের গাড়ির সামনের চাকার সম্মুখে মীনা ও বেচু। ইহারা ভগ্ন বাসখানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। বাসওয়ালাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দেওয়া হয়।



সাপুড়ে বেশে শঙ্কর



সেতুর উপর। পশ্চাতে সুদূরে দুর্গপ্রাসাদ দৃশ্যমান। বাম দিক হইতে—দেবেন্দ্রশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর, রিচার্ড ও বিষ্ণুদাস (ছবি—রাজেন্দ্র)



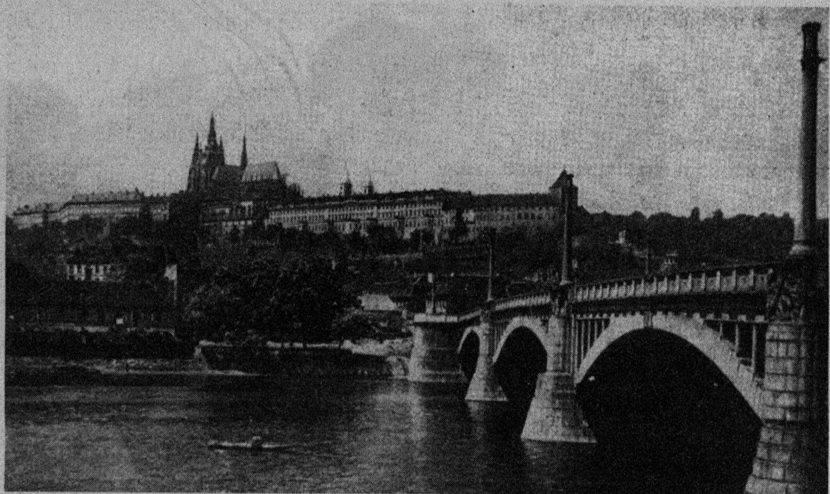
একটি প্রস্তরমূর্তি। স্টকহলমের একটি প্রধান রাজপথ পার্শ্বে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্তিটি দেখিলে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের কথা মনে হয়। মূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান বিষ্ণুদাস সিরালী।



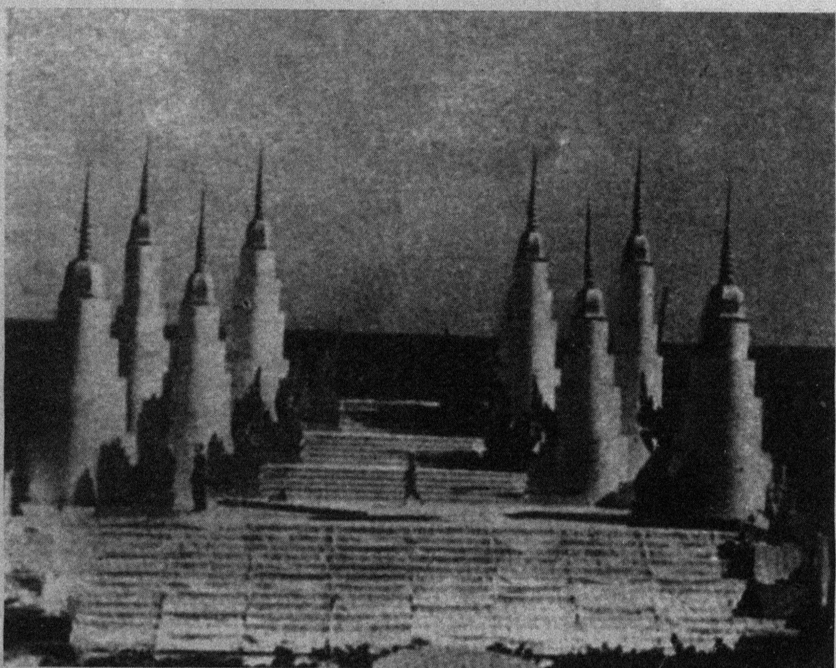
স্টকহলম টাউন হল (ছবি—তিমিরবরণ)



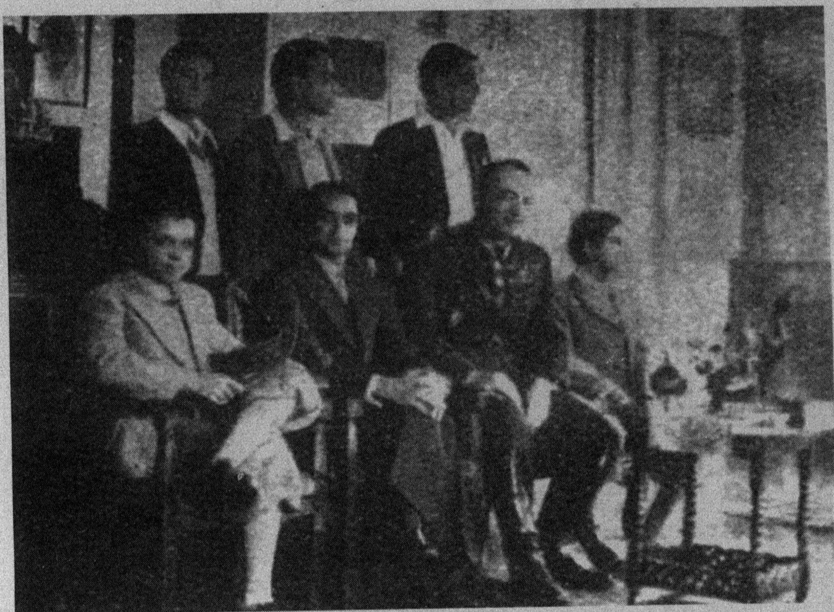
ইন্দ্রনৃত্য (বার্লিনে—প্রকাশ্য নৃত্যের পূর্বে রিহার্সাল—ওয়েস্টন থিয়েটারে)



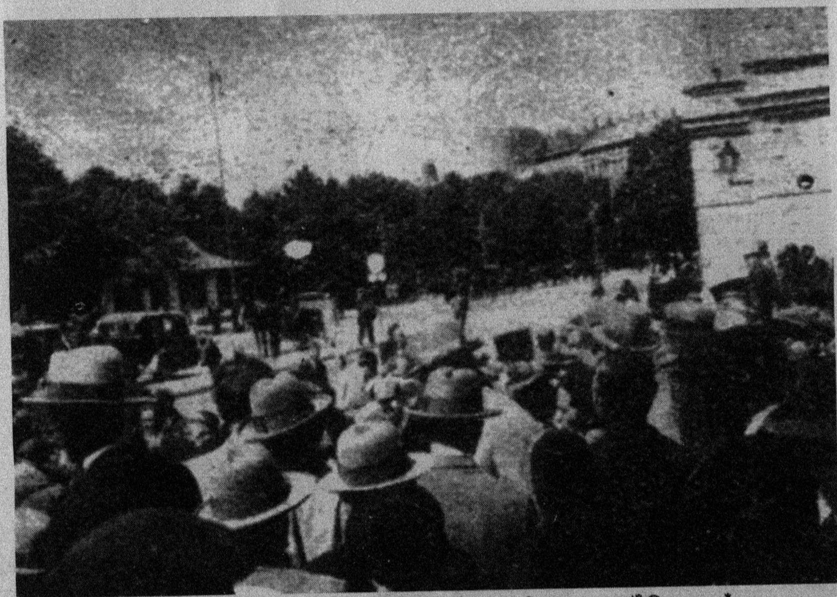
মেনেস সেতু ও দুর্গ—প্রেগ



সমুদ্রতীরে থিয়েটার—মন্টি কার্লো বেলাভূমি হইতে ৫০ গজ মাত্র ব্যবধানে অবস্থিত। কেবল গ্রীষ্মকালে খোলা হয়। (ছবি—রাজেন্দ্র)



সৈন্যাধ্যক্ষের অতিথি। দণ্ডায়মান—দেবেন্দ্র, বেচু, ব্রজবিহারী উপবিষ্ট—বিষ্ণুদাস, উদয়শঙ্কর, সেনাপতি জেনারেল ক্লাকান্ডা ও রবীন্দ্রশঙ্কর। (ছবি—রাজেন্দ্র)



উদয়-দর্শনার্থী জনতা—রিগার রেল স্টেশন। ভারতীয় নর্তক দল রিগা নগরে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাদের দেখিবার জন্য রেল স্টেশনের সম্মুখে ভিড় জমিয়া যায়। (ছবি—তিমিরবরণ)



স্টকহলম জাতীয় উদ্যানে। রেস্তোরাঁর সম্মুখে বেদির উপর কয়েকজন পরিচারিকা তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদে উপবিষ্টা। পশ্চাতে দণ্ডায়মান কেদারশঙ্কর। দক্ষিণে উপবিষ্ট উদয়শঙ্কর। (ছবি—রাজেন্দ্র)



মোজার্টের প্রতিমূর্তি—সালজবুর্গ

ক্ষুদ্র ট্রেন (ছবি—তিমিরবরণ)



স্টকহলম—ন্যাশনাল গার্ডেন্স। রেস্তোরাঁর সম্মুখে চাতালে জাতীয় পরিচ্ছদ ভূষিতা সুইডিস নারীগণের সহিত ভারতীয় দলের রহস্যালাপ। (ছবি—রাজেন্দ্রশঙ্কর)



শিল্পী-সঙ্ঘ পশ্চাতে দণ্ডায়মান—বেচু, ডাক্তার লাভাক, উদয়শঙ্কর, বিষ্ণুদাস শিরালী চেয়ারে উপবিষ্ট—কেদারশঙ্কর চৌধুরী, কনকলতা, শিমকী, ম্যাডাম টুককোভা, ম্যাডাম ভেনেক ও শিল্পীগণ প্রথম সারিতে—রবীন্দ্র, দেবেন্দ্র ও তিমির। (ছবি—রাজেন্দ্র)



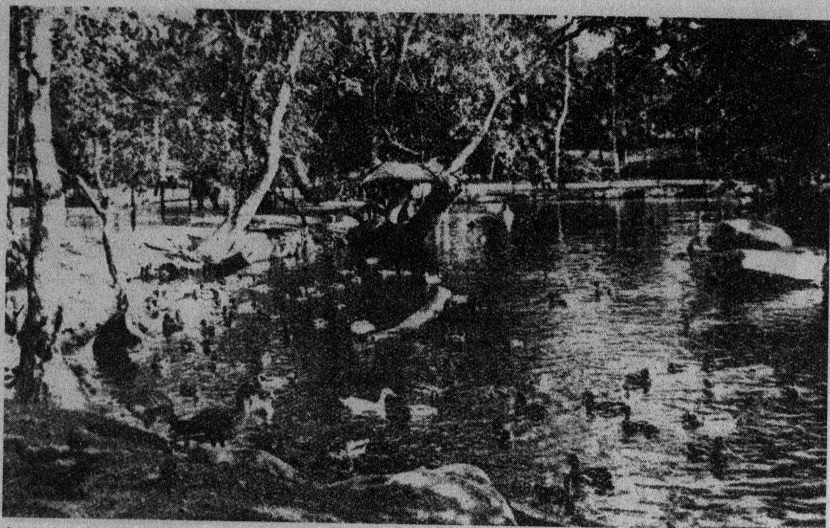
ম্যাডাম প্যাককোভস্কার গৃহে অতিথি পশ্চাতে (বাম দিক হইতে) ম্যাডাম ভেনেক, শিমকী, উদয়শঙ্কর, রবীন্দ্রশঙ্কর, কুমারী প্যাককোভস্কা, বিষ্ণুদাস শিরালী, তিমিরবরণ, ম্যাডাম প্যাককোভস্কা সম্মুখে (বাম দিক হইতে)—মি. লেইকটার, ম্যাডাম লেইকটারোভা, দেবেন্দ্রশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর।



স্টকহলমে—ভারতীয় দল বাম দিক হইতে—রাজেন্দ্রশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, বেচু, অমলা, শিরালী, ম্যাডাম ভেনেক, শিমকী, কনকলতা, কেদারশঙ্কর। (ছবি—তিমিরবরণ)



ম্যাক্স রাইনহার্ট থিয়েটার—সালজবুর্গ (দেওয়াল চিত্রের নমুনা)



স্টকহলম—জাতীয় উদ্যান

লেখক—তিমিরবরণ ভট্টাচার্য

আমার পাকিস্তানের দিনগুলি

জমি তৈরি হয়েছিল ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে। তখনও ইংরাজ রাজত্ব। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান এই শ্লোগান বহুপূর্ব থেকেই চালু হয়ে গেছে। কোনও একটা বিশেষ কাজে লাহোরে আমাকে দু'মাসের জন্য থাকতে হয়েছিল। রুজভেল্ট মারা গেলেন। জার্মানদের তখন শেষ অবস্থা। আমি লাহোরে থাকাকালেই হিটলারের আত্মহত্যা হয়েছিল কি না আমার মনে নেই। লাহোর থেকে বোম্বাই কিছুদিনের জন্য, তারপর কলকাতা।

লাহোরে থাকাকালেই একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ হয় তার নাম জর্জ বলেই জানতুম। সে আমাকে প্রায়ই বলত 'তিমিরদা আমি যদি কখনও ফিল্ম করি তো আপনাকে মিউজিক ডাইরেক্টর করব।' আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যেতুম ও বলতুম, নিশ্চয়ই। ছেলেটার উচ্চ সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করত ছবি করতে কত টাকা লাগে। আমি তাকে কখনও দু'লাখ কখনও তিন লাখ টাকা বলতুম। আসার কথা শুনে তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ত । পকেটে দু' টাকাই নেই তায় আবার দু'লাখ। যাই হোক, লাহোর থেকে আমিও চলে এলুম জর্জও কোথায় মিলিয়ে গেল।

তারপর কয়েক বৎসর এদিক-ওদিক অনেক কাজই করেছি এবং ১৯৫২ সালে আমাকে পুনরায় বোম্বাই যেতে হয় সাধনা বোসের একটা বিখ্যাত নৃত্যনাট্য 'অজন্তা'র সংগীত রচনা ও পরিচালনার জন্য। চার্চ গেটের কাছে এরস (EROS) সিনেমার

সামনেই বিখ্যাত এক হোটেলে সাধনা বোস থাকতেন এবং সেই হোটেলেই আমার থাকবার স্থান হল। বোম্বাইয়ের Airline Hotel-এর ঠিক পাশেই নামটা হচ্ছে...।

একদিন ডাইনিং রুমে খেতে বসেছি এমন সময় জর্জ-এর আবির্ভাব। তৎক্ষণাৎ মনে করিয়ে দিল যে, যদি কখনও সে ফিল্ম করে তো আমার ওপর সংগীতের ভার পড়বে। আমি যে সাত বছর আগে থেকেই রাজি হয়ে আছি সেটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তারপর খানিকক্ষণ আজেবাজে কথার পর জর্জ আমাকে গুডবাই জানাল এবং জানাল যে সে সেই দিনই করাচি চলে যাবে। মনে মনে বললাম বাঁচা গেল। ইতিমধ্যে সাধনা বোসের 'অজন্তা' নৃত্যনাট্যের রিহার্সাল ভালভাবেই চলতে লাগল এবং একদিন যথাসময়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা গেল। নিজেদের প্রশংসা নিজেদের করা শোভা পায় না, তবে আমার অভিমত সেটি একটি যুগান্তকারী নৃত্যনাট্য হয়েছিল।

আমার অভিপ্রায় ছিল 'অজন্তা'-র পরই কলকাতা চলে আসব কিন্তু তা হল না। বম্বে টকিজে আমার একটা কনট্রাক্ট হল 'বাদবান' নামে একটি ছবির সংগীত পরিচালক হিসাবে। শ্রীফণী মজুমদার (বাংলাদেশের মন্ত্রী নন) ছিলেন ছবিটির পরিচালক। আমি ভালভাবেই জানতাম এই ছবি শেষ হতে অন্তত ছয় মাস লাগবেই। এই ছয় মাস আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় হোটেলে বাস করা। সুতরাং বোম্বাই শহরের কাছাকাছি 'খার' বলে একটি জায়গায় একটি ছোটখাটো ফ্ল্যাট পাওয়া গেল স্টেশনের খুব কাছেই। আধুনিক বিদ্যুৎচালিত ট্রেন থাকায় যাতায়াতের কিছুই অসুবিধা হত না। একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক টিকিটও কিনে ফেললাম। সব বড়বড় স্টুডিয়ো ওই লাইনে পড়ে।

ছবি শেষ হতে প্রায় এক বৎসর লাগল। এর পরে দাদরে কোনও একটি বিখ্যাত স্টুডিয়োতে আর একটি ছবিও শেষ

করলাম। তারপর একেবারে বেকার। স্টুডিয়ো মহল ঘুরে খোশামোদ করে কাজ আদায় করবার কলাকৌশল আমার আজও জানা নেই। এদিকে অনেকদিন কলকাতার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই। সুতরাং 'খারে'-তেই রয়ে গেলাম। ভাগ্য যদি প্রসন্ন হন হয়তো একটা কাজ জুটে যাবে এই আশায় দিন কাটাতে লাগলাম।

ভবিষ্যতে কী হবে না হবে কেউ আগে থেকে জানতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করে তো একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেতে পারে কিন্তু সেটা কী বা কীভাবে কী হতে পারে আন্দাজ করা যায় না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কী করা যায় এই ভেবে আমি যখন বিশেষ চিন্তিত, তখনই একটা কাজ হাতে এল। একটি ছবির আবহসংগীত দেবার জন্য। ছবিটির নাম ভুলে গেছি, তবে মি. জিয়া নামে এক ভদ্রলোক সেই ছবিটির পরিচালক ছিলেন। এই ব্যক্তি ছিলেন ছবি পরিচালনায় বিখ্যাত। আর দিলীপকুমার ছিলেন ছবির হিরো। এর দ্বারা বোম্বাইতে আরও কিছুকাল থাকতে হল। বুঝতে পারলাম বোম্বাইতে যাতে আরও কিছুকাল থাকি ঈশ্বরের তাই ইচ্ছা। আশ্চর্যের বিষয় কিছু না জেনেই তিন ভদ্রলোক আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। বহুমাস যাবৎ আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেননি। তবে বোম্বাই ত্যাগ করবার আগে তাঁদের খবর দিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছিলাম।

১৯৫৪ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলাম—এমন সময় কী কারণে হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখি যে, মূর্তিমান জর্জ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাগজ থেকে আমার মুখ তোলবার অপেক্ষায় ছিল।

মনে মনে ভাবলাম সেরেছে, সে যে কোনও একটি সময় ছবি করবে এই কথাটা আবার এক বার বলতে এসেছে। তবুও বিরক্ত হইনি, বন্ধু হিসাবে তার সঙ্গ আমার ভাল লাগত। তাকে

ডেকে এনে ঘরে বসালাম। সে-ই প্রথম কথা পাড়ল। আমাকে অবাক করে দিয়ে বললে যে, 'তিমিরদা সব ঠিক, আমি এসেছি আপনাকে করাচি নিয়ে যেতে।' আমি বললাম, সব পরিষ্কার করে খুলে বলো তো তুমি কী চাও। সে বলল, 'তিমিরদা আমি ছবি করব, তার জন্য উপযুক্ত 'এথি' জোগাড় হয়েছে। আপনি হবেন আমাদের মিউজিক ডাইরেক্টর। আর নিয়েছি ঘনশ্যামকে।' এই ঘনশ্যাম উদয়শঙ্কর কালচার সেন্টারের একজন কৃতি মেধাবী ছাত্র। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে নৃত্যশিল্পী হিসাবে একমেবাদ্বিতীয়ম হিসাবে গণ্য হল। ঘনশ্যাম বাঙালি নয় তবে তার স্ত্রী বাঙালি। এখন তারা সকলেই পাকিস্তানি নাগরিক। আরও তিন জনকে আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমার ভাগনে ধ্রুব চক্রবর্তী, দেবু ভট্টাচার্য একজন বাঁশি বাজিয়ে। আরও একজন গাইয়ে বোম্বাই থেকে নিয়েছিলাম, তাকে আমরা পাণ্ডে বলে সম্বোধন করতাম। দু'মাস বাদে আমার ভাগনে এবং পাণ্ডে ভারতে ফিরে গেল কারণ সেখানকার আবহাওয়া তাদের সহ্য হল না। ঘটনাচক্রে আমাকে থাকতে হয়েছিল চার বৎসর। ১৯৫৮ সালে জুন মাসে আমি ভারতে ফিরে আসি। দেবু ও ঘনশ্যাম আজ পর্যন্ত পাকিস্তানি নাগরিক হয়ে ওই দেশে রয়েই গেল। আমি ভারতে আসার পর তাদের আর কোনও খবর পাইনি। তবে কিছুদিন আগে একটা খবর পেয়েছি যে, বাঁশি-বাজিয়ে দেবু ভট্টাচার্য মোটরসাইকেলে বড় বেশি স্পিড দিতে গিয়ে আর সামলাতে পারেনি সুতরাং পৃথিবীতে আর তাকে মোটরসাইকেল চালাতে হবে না। ঘনশ্যামের খবর যা পেলুম তাতে সে ওদেশে বেশ জমিয়ে বসেছে এবং অবস্থা খুবই ভাল। যাই হোক আমার কথাই বলি।

জর্জ মালিক যা বলল তা থেকে অনুমান করা গেল যে, সে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা কারুর মাথায় হাত বুলিয়ে বাগিয়েছে। অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে যখন আমাকে

জিজ্ঞাসা করল দক্ষিণা কত দিতে হবে, আমি ভেবে দেখলাম ছয় মাসের জন্য এক বিদেশি রাষ্ট্রে যাচ্ছি তায় সে-রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে অতিমাত্রায় মিত্র। সুতরাং মুখ দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ফি চেয়ে বসলাম। জানি যে সে এতটা দিতে রাজি হবে না। বন্ধুত্বের দোহাই পাড়বে। কিন্তু আমাকে নিরাশ ও আশ্চর্য করে দিয়ে এক বারও মস্তক সঞ্চালন না করে আমার কথায় রাজি হয়ে গেল। আমি আরও ক'জন যন্ত্রশিল্পী সঙ্গে নেব তাও জানতে চাইল। তবে বেশিরভাগ যন্ত্রী ওখান থেকে পাওয়া যাবে। বোম্বাইতে আমার বাড়ির কাছেই একজন মার্গসংগীত শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল পাণ্ডে আগেই জানিয়েছি। অতি উচ্চ পর্যায়ের গায়কের প্রয়োজন ছিল না। সংগীতে কিছুটা দখল এবং বেসুরো না হলেই চলত। পাণ্ডের মধ্যে একটা গুণ ছিল। দেবু ভট্টাচার্য ভাল বাঁশি বাজাত। বহুদিন আমার সঙ্গে কাজ করেছিল। তাকে এক বার বলতেই রাজি হয়ে গেল। তখন আমার ভাগনে ঝন্টু (ডাক নাম) তাকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম। সে তখন কলকাতায় ছিল। সে দু'-এক দিনের মধ্যে বোম্বাই রওনা হবে চিঠি লিখে জানাল। বোম্বাইতে বেশ কয়েক বৎসর সংসার পেতে বসেছিলাম। অবশ্য সংসার বলতে একটি মাত্র স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে ইন্দ্রনীল। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম অনেকদিন থেকে কিন্তু আর্থিক সুযোগ এতদিন পাওয়া যায়নি। এইবার সেই সুযোগ এল। সংসার পাততে ও গুটোতে এই দুই কাজেই খরচ লাগে। জর্জ আমাকে অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিল। সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে মে মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৯৫৪ সালে অতি প্রত্যুষে বেনারস এক্সপ্রেসে মাইহার যাত্রা করলাম। সংসারে আমার আরও দুটি প্রাণী সঙ্গে ছিল। আমাদের পুত্রবৎ চাকর দীনবন্ধু এবং কন্যারূপী এক সারমেয়, নাম ছিল তার 'ঠুংরি'। পরদিন রাত্রি তিনটায় মাইহার স্টেশনে অবতরণ করা গেল। যদিও পূর্বেই বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে জানিয়েছিলাম কিন্তু স্টেশনে কেউ আসেননি। অবশ্য

আশাও করিনি রাত্রি তিন ঘটিকায় কেউ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন। স্টেশনে সকলকে রেখে আমি গুরুজির আস্তানা অভিমুখে রওনা হলাম।

প্রায় পঁচিশ বৎসর বাদে মাইহারে পুনরায় এলাম। অবশ্য ১৯৩৬ সালে কয়েক ঘণ্টার জন্য এক বার মাইহারে আসতে হয়েছিল গুরু আলাউদ্দিনকে উদয়শঙ্করের দলে যোগ দেবার অনুরোধ জানাতে এবং গুরুজি রাজিও হয়েছিলেন। সে অন্য কথা। কিন্তু ১৯৩০ সাল আর ১৯৫৪ সালের মাইহারে আকাশ পাতাল তফাত দেখলাম। ইতিমধ্যে গুরুজি তাঁর নতুন বাড়িতে চলে গিয়েছেন। যেখানে একমাত্র রাজবাড়ি ছাড়া আর ইট, বালি, চুন সুরকির বাড়িই ছিল না, ৫৪' সালে অবাক হয়ে দেখলাম মাইহার একটি ছোটখাটো শহরে পরিণত হয়েছে। তবে আরও দুটি পাকা বাড়ি ছিল যার কথা ভুলে ছিলাম। সে দুটি হচ্ছে পোস্ট অফিস ও হাসপাতাল। রাস্তাঘাট সব নতুন লাগল। কোথায় যে ওস্তাদজির বাড়ি অত সকালে কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব। গরমের দিন বহু লোকে খাটিয়া পেতে রাস্তার ওপর নিদ্রা যাচ্ছে। সামনে এগিয়ে চললাম। মাইহার ছোট জায়গা। দু'-এক জন লোককে জাগ্রত অবস্থায় দেখে গুরুজির বাড়ির সন্ধান পেলাম। পাঁচিল ঘেরা দু'মহলা বাড়ি। প্রচুর জায়গা। নজরে পড়ল বাড়ির সামনেই মাঠের মধ্যিখানে খাটিয়াতে মশারি খাটিয়ে কোনও এক ব্যক্তি নিদ্রা দিতেছেন। তখনও সূর্য ওঠেনি। মশারির অভ্যন্তরের ব্যক্তিকে ঠেলা দিয়ে জাগালাম। বিরক্ত মুখে লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী চাই। লোকটিকে আমার পরিচয় দিলাম এবং তারও পরিচয় পেলাম। ভদ্রলোকের নাম যতীন ভট্টাচার্য। ইনি একাধারে গুরুজির সেক্রেটারি ও সরোদ শিক্ষার্থী। তাকে বললাম আমার স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি স্টেশনে বসে আছেন। এই নতুন বাড়ি আগে দেখিনি। আমি তাদের এক্ষুনি নিয়ে আসছি। এমন সময় বাহাদুর খাঁকে দেখতে পেলুম। পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা, খোঁড়াচ্ছে।

বাহাদুর জানত যে আমি আসব, কারণ আমি পূর্বেই বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম। বাহাদুর জানাল তার জ্যাঠামহাশয় তখনও ঘুমুচ্ছেন। আমি যদিও জানতুম যে বাবা অতি প্রত্যুষে ওঠেন। তবে সেই সময়টা ছিল অতি-অতি প্রত্যুষ। স্টেশন ওই বাড়ি থেকে এক মাইল তো হবেই। বাহাদুর নিজেই গোড়া থেকে মুখ বন্ধ করে রাখল। জানাল যে, সে স্টেশনে হেঁটে যেতে পারবে না অর্থাৎ যেতেই পারবে না কারণ অত সকালে কোনও সাইকেলরিকশা পাওয়া যাবে না। যতীনবাবুর পরিচয় বহুকাল পূর্ব থেকেই জানা ছিল কিন্তু এর আগে কোনওদিন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। তাকে স্টেশনে আসতে অনুরোধ আমি করিনি। নিজেই বললাম, কারুর যাবার প্রয়োজন নেই। বাড়িটা চিনে গেলাম আমি নিজেই সকলকে নিয়ে আসছি। এই বলে আমি ওখান থেকে স্টেশন অভিমুখে রওনা হলাম। সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। সেখানে দেখি যে স্টেশনে ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় বিছানা বাক্সয় ঠেস দিয়ে সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করে জিনিসপত্র সাইকেল রিকশায় তোলবার জন্য প্রস্তুত হলাম। ইতিমধ্যে কোন সময় আমার অলক্ষ্যে যতীন ভট্টাচার্য মহাশয় এসে গেছেন। মনে মনে হাসলাম এবং বুঝতে পারলাম, বাবার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে এবং খবর পেয়েছেন যে আমরা এসেছি মাইহারে। শুধু তাই নয় হঠাৎ নজরে পড়ল দূরে পুকুর পাড় দিয়ে বাহাদুর খাঁ খোঁড়াতে খোঁড়াতে যত দ্রুত সম্ভব হেঁটে আসছে। বাবার কাছে খোঁড়া পা'র অজুহাত চলত না। যাই হোক, লটবহর নিয়ে সাইকেলরিকশা আমাদের সকলকে বহন করে গুরুগৃহে পৌঁছে দিল। মা অর্থাৎ গুরুপত্নী বেরিয়ে এলেন, ধান দূর্বা হাতে নিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করলেন। আমরা প্রণাম করলাম। আমাদের বিবাহের পর এই প্রথম আমাদের জোড়ে দেখলেন। তারপর বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলাম। আমাকে যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব পুত্রবৎ

দেখেন তা নয়, আমার শিক্ষার প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছিলেন সকলকেই তিনি বলতেন, তিমিরবরণ আমার বড় ছেলে। যাই হোক, বড় ছেলে বলেই গুরুবাড়িতে আপাতত থাকবার ব্যবস্থা হল। সেবার আমি মাইহারে ছিলাম মাত্র চার দিন। ইতিমধ্যে আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে আমার স্ত্রী, পুত্র, চাকর, কুকুরের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলাম। নিশ্চিন্ত হলাম যে, পুত্র ইন্দ্রনীলকে বাবার কাছে সংগীত শিক্ষার জন্য রাখতে পেরে। এইবার আমার হাত-পা ছাড়া পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে যেতে রাজি। যাই হোক গুরুপ্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে মাইহার ত্যাগ করে বোম্বাই রওনা হলাম।

বোম্বাইতে আমরা সকলে একসঙ্গে মিলিত হলাম। সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে প্লেনে চড়ে আমরা পাঁচজন, জর্জ মালিক, ধ্রুব চক্রবর্তী ওরফে ঝুন্টু (আমার ভাগনে) ঘনশ্যাম, পাণ্ডে ও আমি পশ্চিম পাকিস্তান করাচি অভিমুখে যাত্রা করলাম। করাচি বোম্বাই থেকে আকাশপথে মাত্র এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যায়। ল্যান্ড করবার আগে প্লেনটা এক বিচিত্র ব্যবহার করেছিল। পাণ্ডে কখনও ওড়েনি, ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়ে ক্যা হো রহা হ্যয়।' আমার ভাগনে উত্তর দিল খুব গম্ভীর হয়ে 'আরে ইয়ে হাওয়াই জাহাজ খারাপ হো গিয়া।' পাণ্ডে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এক থলি বার করে একটা জপের মালা বার করে 'হরি ওম নমঃ শিবায়, হরি ওম নমঃ শিবায়' উচ্চস্বরে জপ করতে লাগল। যাই হোক, করাচিতে নির্বিঘ্নে অবতরণ করা গেল। অভ্যর্থনার আয়োজন নিয়মমাফিক ছিল। কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা থেকে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার উপস্থিত হয়ে তাদের যথাকর্তব্য পালন করে গেল মামুলি পন্থায়। ফটোগ্রাফাররা তাদের কাজ সেরে নিল। পাকিস্তানে আমি অশ্রুতপূর্ব ছিলাম না। তারা অত্যন্ত খুশির ভাব দেখাল। আমাদের জন্য একটা বেশ ভাল ফ্ল্যাট ভাড়া করা

হয়েছিল। আমাদের খুব পছন্দ হয়েছিল ফ্ল্যাটটা। শহরের বাইরেই বলা যায়। বড় বড় চারটি ঘর। দুটি বাথরুম, দুটি কিচেন। আসলে এটা একসঙ্গে দুটি ফ্ল্যাট। বাড়িটার চারপাশে উঁচু পাঁচিল ঘেরা। দু'দিকে দুটি গেট। ফ্ল্যাটটার কাঠামো ইংরাজি এল্ (L) অক্ষরের মতন। মধ্যে একটি সাধারণ বসবার ঘর ছিল বেশ বড় সাইজের। অর্থাৎ পাঁচটি ঘর সর্বসমেত। তা ছাড়া বাড়ি ও পাঁচিলের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। বন্দোবস্ত খুবই ভাল ছিল। একজন বৃদ্ধ খানসামা বিলাতি ও মোগলাই রন্ধনে প্রথম শ্রেণীর ছিল। জলের ট্যাঙ্ক ও কল ছিল। বাড়িওয়ালা পার্টিশনের পর ভারত থেকে করাচিতে চলে আসেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে। পিতা ও পুত্র একসঙ্গেই এসেছিলেন। খোদাতালার আশীর্বাদে তাঁরা সফল হয়েছিলেন। ফ্ল্যাটের ভাড়া ছিল তিনশো। আমরা এক-একজন এক-একটা ঘর দখল করে নিলাম। তবে আমার ভাগনে ঝন্টু ও বংশীধারী (রি?) দেবু একই ঘরে বসবাস করাটাই পছন্দ করল। আমি যে টিম নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা হল নৃত্যে ঘনশ্যাম, সেতারে ঝন্টু, বাঁশি দেবু ও কণ্ঠে পাণ্ডে।

আমাদের ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ছিল কিন্তু পাকিস্তানে থাকবার মেয়াদ ছিল মাত্র ছয় মাস। একটা ছবি শেষ হতে ছয়মাসের বেশি লাগা উচিত নয়, অবশ্য যদি কোনও বাধাবিঘ্নের উৎপত্তি না হয়। ছবি করতে গেলে বাধা আসে মাত্র এক দিক থেকে। সেইটাই হচ্ছে অন্যান্য যে-কোনও বাধার মূল কারণ। হাতের দুই আঙুলে কাল্পনিক টাকা বাজিয়ে মুখে বলে এথি। তা আমাদের মহাজনের এথির অভাব ছিল না। মাত্র পাঁচ লাখ তিনি মঞ্জুর করেছিলেন। মহাজনের নাম আমি ভুলে গেছি। আমাদের জর্জ মালিক। এরা আবার পাঁচ ভাই। আপন ভাই নয়। এদের বাবারা দুই ভাই ছিলেন। এক ভাইয়ের তিন ছেলে জর্জ, রবার্ট ও সোহেল। অন্য ভাই দুটি ....। এরা খ্রিশ্চান কিন্তু খুব উঁচু জাতের নয়। চেহারা দেখলেই বোঝা

যায়। তবে দুই তরফের দুই বড় ছেলে ভাল লেখাপড়া শিখেছে। এম. এ. পাশ। অন্যজন কোনও একটা বড় স্কুলের হেড মাস্টার আর জর্জ ছিল বেকার। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাদের ছিল না। কিন্তু ফাইনান্স পায় হঠাৎ এক অঘটনে। মহাজনের নাম ছিল ইহাইয়া খাঁ। জর্জের ভাই রবার্ট মালিক বইয়ের ব্যবসা করত। একদিন তার নিজের কাজে সে ইহাইয়ার সঙ্গে দেখা করতে যায়। এর আগে রবার্ট নামে অন্য এক ব্যক্তি ফিল্ম সম্বন্ধে ওই মহাজনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। ইহাইয়া ভুল করে ছবি সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু করেন। এই রবার্ট প্রথমটা অবাক হলেও পরে ওই সুযোগটা হাতছাড়া করেনি। যাই হোক, ফাইনান্স তো হল। কিন্তু টাকা হাতে এলেই তো আর ছবি আপনা-আপনি হয় না। তার জন্য দক্ষ বা অদক্ষ কারিগর দরকার। করাচিতে করাচি স্টুডিয়ো নামে একটা ফিল্ম স্টুডিয়ো ছিল। সেখানকার মালিক ছিলেন দেওয়ান সর্দারিলাল। ইনি লাহোরে এক বিখ্যাত ফিল্ম স্টুডিয়োর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর করাচিতে আসেন। ওখানে প্রাক্ ভারত গভর্নমেন্টের এক চালের গুদাম ছিল। সেটাকে তিনি ভাঙা-গড়া করে কাজ চালাবার মতন একটি স্টুডিয়ো খাড়া করেন। দেওয়ান সর্দারিলালের শরীরের ওজন ছিল আড়াইশো পাউন্ডের ওপর। ওজনের কথাটা বলতে হল একটা মজার ঘটনার জন্য। একদিন সর্দারিলালকে আমাদের ফ্ল্যাটে সান্ধ্যভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আহার ও পানীয় দুই ছিল। আহার শেষ হতে রাত্রি দশটা বেজে গেল। সর্দারিলাল সস্ত্রীক বাস করতেন স্টুডিয়োতে আলাদা দুটি ঘর নিয়ে। আমাদের ফ্ল্যাট থেকে হাঁটাপথে দশ মিনিটের রাস্তা। ওই রাত্রে কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। যদিও প্রোডাকশনের জন্য দু'খানা মোটর গাড়ি কেনা হয়েছিল, কিন্তু ড্রাইভার রাত্রে গাড়ি গ্যারাজে তুলে বাড়ি গিয়েছিল। ওই সময় ট্যাকসি পাওয়াও অসম্ভব ছিল।

মোটর গাড়ি ছাড়াও একটি সাইকেল কেনা হয়েছিল চাকরবাকরদের জন্য। সর্দারিলাল ওই সাইকেল চড়ে বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমার দুর্ভাবনা হল ওই আড়াইশো পাউন্ড সাইকেলটি সহ্য করতে পারবে কি না। যাই হোক, আমাদের অবাক করে দিয়ে তিনি ওই বৃদ্ধ বয়সে অতি নিপুণতার সঙ্গে চড়ে চলে গেলেন। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। পরদিন লোক পাঠিয়ে সাইকেলটি আনা হল। দেখা গেল সাইকেলটাই মানুষের ঘাড়ে চেপে এসেছে। পেছনের চাকাটা বাংলা পাঁচের আকার ধারণ করেছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পরে অবশ্য জানতে পারলাম, অন্ধকারে একটা গর্তে পিছনের চাকাটা পড়তেই সাইকেলটির চেহারা পালটে গেল। ভাগ্য ভাল ঘটনাটা দেওয়ানজির বাড়ির কাছেই হয়েছিল।

এবারে ডাইরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় করা দরকার। তাঁর নাম হচ্ছে মহম্মদ হোসেন। ফিল্ম সম্বন্ধে তাঁর যা কিছু শিক্ষা সবই বোম্বাইতে। দেশভাগের পর তাঁর নিজের দেশ হায়দ্রাবাদে চলে যান। কিন্তু কিছুকাল বাদে যখন ভারতীয় জওয়ানেরা অবৈধভাবে হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করে তখন মহম্মদ হোসেন ঘৃণাভরে সে দেশ ত্যাগ করে করাচিতে চলে আসেন। আমাদের প্রডিউসারের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হয়েছিল, কখনও জানবার কৌতূহল হয়নি। আমার কোনও ধারণা ছিল না পরিচালক হিসাবে তাঁর দৌড় কতখানি। শুনলাম গল্পটি তাঁরই সৃষ্টি। চিত্রনাট্য ইত্যাদি সবই মহম্মদ হোসেনকৃত। কয়েকদিন পরিচালকের সঙ্গে মেলামেশা করে যা বুঝতে পারলাম, লোকটি উর্দুতে পণ্ডিত। ইংরাজিতেও বেশ উচ্চশিক্ষিত, চমৎকার। একটি বিশেষ গুণ, পৃথিবীর ফিল্ম সংক্রান্ত বহু তথ্য তিনি ভাল করে পড়াশোনা করেছেন। ফিল্ম সংক্রান্ত অতি আধুনিক তথ্যাদি মহম্মদ হোসেন নিয়মিত চর্চা করতেন। বম্বেতে তিনি স্টুডিয়োগুলিতে যাতায়াত করতেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং তিনি নিজে কখনও ছবি

করেননি সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। এই পঞ্চপাণ্ডব মল্লিক ভ্রাতৃ সঙ্ঘকে কীভাবে বধ করলেন জানা নেই। মল্লিক ভাইয়েদের ছবি করা সম্বন্ধে কোনওই ধারণা ছিল না। তাদের ধারণা ছিল মহম্মদ হোসেন একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ডাইরেক্টর। মহম্মদ গিলানি নামে এক ভদ্রলোক ফরমাজ অনুযায়ী কয়েকটি গান রচনা করেন এবং আমাকে দেওয়া হয় সুরারোপিত করবার জন্য। প্রথম গানটি যখন সুর সংযোজনা করবার জন্য আমাকে দেওয়া হয় তখন মহম্মদ হোসেন আমাকে বললেন, 'এই গানটি দেশ কিংবা আশাবরী রাগে চমৎকার হবে।' যদিও তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভক্ত ছিলেন কিন্তু দেশ বা আশাবরী কীরকম তাঁর তা জানা নেই। বোম্বাইয়ের রঞ্জিত মুভিটনের বিখ্যাত অভিনেত্রী-গায়িকা খুরশীদ ছিলেন এই ছবির নায়িকা। বেশির ভাগ গানই খুরশীদের ভাগে পড়েছিল। গোটা দশেক গানের সুর করেছিলাম। খুরশীদের অভিমত ছিল সবগুলিই হিট সং হবেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গানের সুরগুলি শেষ করার পরও ছবির গল্পটা যে কী, তা আমি কেন কেউই জানতে পারেননি। তখনও নাকি গল্পটা তৈরি হচ্ছে। এদিকে গানগুলি সব টেক করা হয়ে গেছে। মহম্মদ হোসেন শুটিং করতে আরম্ভ করে দিলেন কিন্তু গল্প আমরা কেউ জানতাম না, সেটা মহম্মদ হোসেনের মাথার ভিতরে আছে। শুটিং অনেক এগিয়েছে, এমনকী ত্রি-চতুর্থাংশ শুটিং শেষও হয়েছে। মধ্যে মধ্যে ট্রায়াল দেখতুম কিন্তু গল্পের মাথামুন্ডু কিছুই বোঝা যায় না। এই করতে প্রায় এক বছর কেটে গেল। ভিসায় পাকিস্তানে থাকবার মেয়াদ মাত্র দু'মাস আমাদের ছিল। দু'বার তিন মাস করে ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ছবির মূলধন পাঁচ লাখ টাকা খতম। ছবি বন্ধ হয়ে গেল। পঞ্চপাণ্ডব প্রডিউসারগণ নিজ গৃহে বন্দি হয়ে রইলেন। বলতে ভুল হয়েছে, আমার ভাগনে ধ্রুব চক্রবর্তী ও পাণ্ডে

ভারতে ফিরে গিয়েছে। সেখানকার জল-হাওয়া সহ্য করতে পারেনি। যাই হোক আমি নিজে আবার তিন মাসের ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছি। অবশ্য তিনজনের জন্যই।

একেবারে রিক্ত হাতে ভারতে ফিরে যেতে চাইনি। সেইজন্য সেখানে অর্কেস্ট্রা গঠনের ওপর মনোনিবেশ করলাম। আমার সঙ্গে অনেক মহামান্য মন্ত্রীদের পরিচয় ছিল। প্রথম যখন করাচিতে আসি তখন ফিল্ম সংগীতের কোনও প্রয়োজনই হত না। কারণ ওখানে দেওয়ান সর্দারিলাল করাচির ওই একটি মাত্র স্টুডিয়োর মালিক। তবে একটি অতি আধুনিক স্টুডিয়ো তৈরি হচ্ছে, শেষ হতে বেশি দেরি নেই। সেখানে যন্ত্রসঙ্গী শিল্পী যাদের পেলাম তারা জীবনে কখনও ছবিতে বাজায়নি। এক দল যন্ত্রী এসেছিল ওখানকার শ্রেষ্ঠ হোটেল 'মেট্রোপলিটান' থেকে। আর এক দল এসেছিল দু'-একটা ব্যান্ড পার্টি থেকে। ব্যান্ড পার্টি হচ্ছে যারা বিবাহ ইত্যাদিতে রাস্তা দিয়ে বর কিংবা কোনও বিগ্রহের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বাজিয়ে চলতে থাকে, তারাই। একটা প্রবাদী কথা আছে 'গাধা পিটে ঘোড়া করা'। দু' নম্বর দলের যন্ত্রীদের দিনে দু' টাকা করে ফি ছিল। চার বছর বাদে যখন ভারতে ফিরে আসি, তখন তাদের দাম বেড়ে হয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। এত বছরে নিশ্চয় তাদের দাম আরও বেড়েছে। তা হলে বুঝুন গাধা পিটে ঘোড়া হয় কি না। ভারতে ফিরে দেবু ও ঘনশ্যামের কোনও খবর পাইনি।

আমার একটা মারাত্মক দোষ হচ্ছে সকলের ঠিকঠিক নাম আমার মনে থাকে না। দু'-একজনের নাম আমি নিজেই বানিয়ে লিখছি, তাতে অবশ্য ঘটনার হেরফের কিছু হবে না। বিখ্যাত কোটি-কোটিপতি ব্যবসায়ী আদমজির নাম পাকিস্তানে সকলেই জানে, এমনকী ভারতেও তিনি বিখ্যাত। দেশ বিভাগের আগে তিনি বোম্বাইতে থাকতেন। পাকিস্তান হবার পর তিনি করাচিতে নতুন করে ব্যবসা ফাঁদেন। তাঁর প্রথম সেক্রেটারি জনাব সেকেন্দার (নামটা ঠিক নয়) একজন অতি

পরোপকারী ব্যক্তি। তাঁরই কন্যা ওই 'ফনকার' ছবির হিরোইন। যদিও ছবিটা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা জানতুম এই ছবি আবার চালু হবেই। ইতিমধ্যে লতিফ নামে আর এক ভদ্রলোক একটি ছবি শুরু করলেন, নাম দিলেন 'আনোখি'। আমি সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পেলাম। এই লতিফ ভদ্রলোক ছিলেন হিন্দু, নাম ছিল লচ্ছু। পরে তিনি বিবাহ করে হন লতিফ। তাঁর পূর্বপুরুষ প্রথম ব্রাহ্ম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন।

বোম্বাইতে একটি ছবি হয়েছিল 'ট্যাকসি ড্রাইভার', তারই উর্দু সংস্করণ হচ্ছে 'আনোখি'। ট্যাকসি ড্রাইভারের হিরোইন ছিলেন ওই লচ্ছুর ভাগনি। এই ছবিটি আমার আলোচ্য বিষয় নয়। অর্থাৎ আমি বেকার হয়ে যাইনি। ইতিমধ্যে 'ফনকার' ছবির মহাজন একজন আনাড়ি পাঠালেন, ছবিটা যা হয়েছে, সেটাকে কোনও রকমে এডিট করে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবিতে দাঁড় করাতে। আমি পূর্বেই গানগুলি টেক করে দিয়েছিলাম। ওই জনাব ডাইরেক্টর গানগুলি সমেত এডিট করে একটি জগাখিচুড়ি তৈরি করে ফেললেন। ছবি দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু জনাব সেকেন্দর দেখলেন, তাঁরই কন্যার প্রথম ছবি যদি মার খায় তো বেইজ্জতের শেষ থাকবে না। জনাব সেকেন্দরের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি 'ফনকার'-এর মহাজনের সঙ্গে কথা বলে পুনরায় মহম্মদ হোসেনকে বহাল করলেন ছবিটি শেষ করার জন্য। মহম্মদ হোসেনের একটি গুণ ছিল, ভাল শ্রুতিমধুর ক্লাসিকাল সংগীতের সত্যকারের সমজদার। এই ছবিতে আমি তিনটি গানের সুর করেছিলাম, দরবারি কানাড়া, আড়ানা ও গৌড় সারঙ্গ এই তিনটি রাগের ওপর। গৌড় সারঙ্গের গানটি সারা পশ্চিম পাকিস্তানে Song of 1956। অর্থাৎ ওই বৎসরের শ্রেষ্ঠ গান। মহম্মদ হোসেন কী ধরনের সংগীতরসিক ছিলেন তার একটা নমুনা দিই। ছবিতে হিরোইনের পাঁচ মিনিটের পিয়ানো বাদনের দৃশ্য আছে।

পিয়ানো বাদন দৃশ্যটি অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ওই পিয়ানো-সংগীতটির জন্য হিরোইনের পিতামাতা আমাকে একটি বিশেষ পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছিলেন। পুরস্কারটি কী সেটা আমার জানা ছিল না। যাই হোক, ফরমাশ মতন একটি শ্রুতিমধুর সুর বিশেষভাবে পিয়ানোর উপযুক্ত একটি পিস তৈরি করে দিয়েছিলাম। যদিও আত্মপ্রশংসা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সকলেরই অভিমত ছিল যে, পিসটা অতি চমৎকার। মহম্মদ হোসেন অতিমাত্রায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। এক-একটা হিট টিউন হয়ে যায় সেটা কখনও পুরনো হয় না। সংগীতাংশের মধ্যে খানিকটা ছিল আমার ওই একটি হিট টিউন, প্রায় পনেরো বৎসরের পুরনো। আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার অনুপস্থিতিতে মহম্মদ হোসেনকে গোপনে জানিয়ে দেয় যে, উক্ত মিউজিক পনেরো বৎসরের পুরাতন। অর্থাৎ কিনা আপনারা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেটার সঙ্গত কোনও কারণ নেই। এই গোপন খবরে সাধারণ লোকের বিপরীত প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ডাইরেক্টর মহাশয় লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন যে, তা হলে এই মিউজিক পিসটা রাখতেই হবে। কারণ যে-সংগীত পনেরো বৎসর পরেও এমন ফ্রেশ (টাটকা) লাগে সেইটাই হল সত্যিকারের মিউজিক। বলা বাহুল্য আমি পুরস্কার পেয়েছিলাম একটি 'উনসত্বর'। যাই হোক, ছবিটি শেষ হল। কিন্তু নতুন কোনও শট্ নেওয়া হয়নি, ছবিটি পুনরায় রি-এডিট হয়েছিল। ছবিটি যেদিন মুক্তি পেল সেদিন মহম্মদ হোসেন হাউসে উপস্থিত থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করেননি। কারণ তিনি জানতেন, ছবি দেখে জনতা তাঁকে ওই হাউসের নীচে জ্যান্ত কবর দেবে। আমারও শুভমুক্তি দেখবার আগ্রহ ছিল না কিন্তু বিশেষ অনুরোধে আমাকে যেতেই হল। ছবি চলাকালে যে সমস্ত মন্তব্য শুনছিলাম, তাতে কানমলা না খেয়েও কর্ণযুগল রক্তিমাভ হয়েছিল যে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ছবি শেষে যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম

দেখতে পেলাম যে দর্শককুল মারমুখী হয়ে নীচে অপেক্ষা করছে ডাইরেক্টরের জন্য। জনতার মধ্য থেকে একজন আমাকেই দেখিয়ে দিল, ওই হ্যায় ওই হ্যায়। ব্যাস আমাকে সকলে ঘিরে দাঁড়াল এবং কৈফিয়ত তলব করল কেন আমি এ ধরনের ছবি করেছি। আমি দর্শকদের হাতজোড় করে জানালাম, আমি ডাইরেক্টর নই এবং এই ছবির সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নই। পরিত্রাণ পাবার জন্য জানালাম, আমি একজন কাগজের রিপোর্টার। কোনও রকমে সেদিন প্রাণে বেঁচে ফিরেছিলাম।

আমাকে ঘটনাচক্রে পাকিস্তানে থাকতে হয়েছিল চার বৎসর। প্রথম ছ' মাসের পর পুনরায় ভিসার মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে নিয়েছিলাম। তারপর পুনরায় তিন মাস। ওই তিন মাস শেষ হবার পর পুনরায় ভিসা পেতে বেগ পেতে হয়েছিল। শর্ত ছিল এরপর আমাকে আর ভিসা দেবে না। কিন্তু আমার থাকবার বিশেষ কারণও ছিল। কিছু কাজ আমার হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু ভিসা রিনিউ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সেটা ছিল ১৯৫৬ সাল। আমার দু'-একজন হিতৈষী বন্ধু পরামর্শ দিলেন 'আপনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করুন।' আমি তো অবাক। তাঁদের বললাম 'এই বয়সে মুসলমান হবার সবরকম নিয়মকানুন কি সহ্য করতে পারব?' তাঁরা হেসে জবাব দিলেন, কেবলমাত্র কলমা পড়লেই চলবে। আর নামটা তিমিরবরণের বদলে তাইমুর বিরানী হলেই চলবে। তখন আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'দেখুন মশাই আপনি ছাড়াও আমার অনেক বিশিষ্ট মুসলমান বন্ধু আছেন। আমি যদি এই সুবিধা আদায় করবার জন্য ধর্মান্তরিত হই তা হলে তাঁরা আমাকে যে সম্মান দিয়ে থাকেন সেটা আর পাব না। আমার মনে হয় তাঁরা আমাকে ঘৃণাই করবেন। তা ছাড়া আমি শিল্পী। এইটাই আমার ধর্ম। আমি যে-কোনও ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ আমার হবে না।' ভদ্রলোক খানিকক্ষণ

চুপ করে থেকে বললেন যে, তা হলে আপনি এক কাজ করুন, পাকিস্তানি নাগরিক হয়ে যান তা হলে ভিসাফিসার কোনও প্রয়োজন হবে না। ভেবে দেখলাম এটা মন্দ আইডিয়া নয়। দেবু ও ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। আমার রাজি হওয়াটায় খুব একটা আন্তরিকতা ছিল না।

পরদিনই তিনখানা দরখাস্ত লেখা হয়ে গেল। দেবু ও ঘনশ্যাম দরখাস্ত পেশ করে দিল। আমি দরখাস্তটি পেশ করিনি। কিন্তু সারা করাচিতে প্রচার হয়ে গেল যে, আমিও দরখাস্ত পেশ করেছি। এক মাসের মধ্যেই দেবু ও ঘনশ্যামের ডাক পড়ল। ফিরে এল দু'জনে দু'খানা পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে। শুনলাম যে তাদের ভারতীয় পাসপোর্ট দু'খানা তাদের সামনেই কুচিকুচি করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিল। এর পরেই কিন্তু আমি দরখাস্ত পেশ করেছিলাম। এরপরে মাসখানেক চুপচাপ, আমার দরখাস্তের কোনও জবাব আসেনি।

এমন সময় পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরির স্ত্রী আফরোজা বেগম তার দলবল নিয়ে করাচি এসে হাজির। সেটা ১৯৫৬ সাল, জুন কি জুলাই মাস হবে। এর দশ-বারো বৎসর আগেই বুলবুলের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বুলবুল ইউরোপে বিশেষ করে হল্যান্ডে নাচের দলবল নিয়ে ঘুরে এসেছে। বুলবুলের জন্মস্থান যদিও পূর্ববঙ্গে কিন্তু সে কলকাতার বাসিন্দাই ছিল। দলের সমস্ত নৃত্য ও সংগীতশিল্পীরা ছিল কলকাতার। সংগীতশিল্পীরা ছিল আমারই দলের। বুলবুল ছিল আমার ছোট ভাইয়ের মতন। সে এম এ পাশ করেছিল। ইংরেজি জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং অদ্ভুত বাগ্মী ছিল। নৃত্যশিল্পী হিসেবেও সে ছিল অনন্য। ১৯৩০ সালে প্রথম একা যখন উদয়শঙ্কর কলকাতায় আসেন তারপরই বুলবুলের আবির্ভাব। আমি সেই বছরই উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপে চলে যাই। তারপর বুলবুল আমার অগ্রজ শ্রীমিহিরকিরণের কাছে

আমাদের বাড়ি শিবু ঠাকুরের গলিতে আসা-যাওয়া আরম্ভ করে এবং নৃত্যে যা কিছু উৎকর্ষতা লাভ করেছিল ওই বাড়ি থেকেই। যাই হোক, আবার করাচিতে ফিরে যাই।

আফরোজা যে-দলবল নিয়ে এসেছিল, শিল্পীরা সবাই কলকাতার। অর্থাৎ বুলবুল যে-দল নিয়ে ইউরোপ গিয়েছিল সেই দলই। কীভাবে জানি না আফরোজা পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্টের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করতে পেরেছিল ইউরোপে কালচারাল শো নিয়ে যাবার জন্য। কলকাতা থেকে শিল্পীদের আনিয়ে ঢাকায় দু'মাস রিহার্সাল দেয়। তারপর ইউরোপ রওনা হবার আগে করাচিতে আসে এবং কয়েকটি শো দেয়। সেই সময় একদিন নজরুল জন্মতিথি উপলক্ষে আমি এক জায়গায় নিমন্ত্রিত হই, সেইখানেই আফরোজার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে আফরোজা কান্নায় ভেঙে পড়ল, কারণ বুলবুলের সঙ্গে তার বিবাহের উপলক্ষ ছিলাম আমিই। করাচির একটি প্রেক্ষাগৃহে আফরোজার যে ক'টি শো হয়েছিল সেখানে আমাকে রোজই হাজির থাকতে হত। গভর্নমেন্টের ব্যাপার তো কাজেই কর্তৃপক্ষের অনুরোধ, সব সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না আমি যেন একটু নজর রাখি। দেখলাম সব ক'টি নৃত্যই বুলবুলের পরিকল্পনা। দু'-একটি বাদে সব ক'টিরই সংগীত আমারই দেওয়া। কারণ বুলবুল বেঁচে থাকতে ওইসব নৃত্যের সংগীত আমিই করেছিলাম, বাকি দু'-চারটে নৃত্য সংগীতের স্রষ্টা ছিল আমার অগ্রজপুত্র পরলোকগত ভোম্বল (অমিয়কান্তি)।

পাকিস্তানের অনেক উচ্চ পদাধিকারী বহু ব্যক্তি ছিলেন এই দলের পেছনে। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি—ইত্যাদি নানাভাবে। দেখলাম আফরোজার বাহাদুরি আছে। তারিফ না করে থাকতে পারলাম না। ইউরোপে মাত্র দুই মাসের ট্যুর, কিন্তু ছয় মাস পূর্বে থেকেই গভর্নমেন্ট পর্যায়ে এর জন্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। আফরোজা ছাড়া দলের সকলেরই ভারতীয় পাসপোর্ট ছিল। সুতরাং ছয় মাসের জন্য

সকলকেই পাকিস্তানি নাগরিক করা হল। ভারতীয় পাসপোর্টগুলি জমা রেখে তার বদলে সকলের জন্য পাকিস্তানি ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠিক করলেন যে, তিমিরবরণকে দলের অভিভাবক করে পাঠানো হোক। ওখানকার চিফ কমিশনার আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল ভারত বিভাগ হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই। খাতির করে আমাকে বসালেন, কফি আনালেন। কিছুক্ষণ বাদে আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন, 'আপনার মতন লোক যদি এই দলের সঙ্গে থাকেন তো আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।' মনে মনে আমি আনন্দে দিশাহারা হবার জোগাড়। বেশ চিন্তিত হবার ভান করলাম। বললাম, 'আপনি যখন অনুরোধ করছেন তখন সেটা প্রত্যাখান করতে পারি না।' তিনি তো খুব খুশি। বললেন, 'যাক আমরা কতটা যে ভরসা পেলাম তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।' অবশ্য সেখানে আরও অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই খুশি হয়ে আমার করমর্দন করলেন। আমার মনের অবস্থা তখন আকাশছোঁয়া। বিনা খরচে দু'মাসের জন্য ইউরোপ ভ্রমণ করা মহা সৌভাগ্যের কথা। তা ছাড়া আমি চিরকালই ভ্রমণবিলাসী। আফরোজাও চেয়েছিল আমি যেন সঙ্গে যাই। পরদিন সকালে শিল্পীর দল যে হোটেলে ছিল সেখানে গেলাম। দেখলাম যে, আমার যাওয়ার খবরটা ইতিমধ্যেই সকলে জেনে গেছে। সকলেই খুব আনন্দিত, একজন বাদে। যন্ত্রীদের মধ্যে সকলেই আমার ছাত্র ছিল। একজনকে সংগীত পরিচালক করা হয়েছিল। অবশ্য তখন আমার যাবার কোনও কথাই ওঠেনি। সেই সংগীত পরিচালক আনন্দে মুখ চুন করে আমাকে বলল, 'তিমিরদা বড় খুশি হলুম।'

এরপর প্রয়োজন হল আমাকে পাকিস্তানি করবার। অর্থাৎ আমার ভারতীয় পাসপোর্ট জমা রেখে পাকিস্তানি পাসপোর্ট

গছিয়ে দেওয়া। ওই ব্যাপারে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল। অবশ্য কথাটা কারওকে বলিনি। তারপর যখন আমার ডাক পড়ল এবং আমার ভারতীয় পাসপোর্ট চেয়ে বসল, আমি অম্লানবদনে জানালাম যে সেটা তো আমার কাছে নেই। আমি যে পাকিস্তানি নাগরিক হবার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম সেটা প্রায় হয়ে এসেছে এবং আমার পাসপোর্ট তারা নিয়ে নিয়েছে। এ-কথায় তারা খুব খুশিই হল এবং অচিরেই আমাকে পাকিস্তানি পাসপোর্ট ইসু করে দিল। সারা করাচিতে প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে, আমি পাকিস্তানি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছি। তখন ভারতীয় হাইকমিশনার ছিলেন বোধহয় কোনও একজন মি. দেশাই এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন একজন বাঙালি। মি. দেশাই এবং আর সকলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে আমি পাকিস্তানি নাগরিক হয়েছি। তিনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন, তিমিরবরণ যে পাকিস্তানি হয়ে যাবেন এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। প্রথম যখন করাচিতে যাই তখন ওই হাইকমিশন থেকে আমাকে বিরাট অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ও পাকিস্তানি নাগরিক এবং নাগরিকা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খাদ্য ও সর্ব প্রকারের পানীয় অফুরন্ত ছিল। কিন্তু আমার পক্ষে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীকেও আমার আসল স্বরূপ বলতে পারি না। যাই হোক, ইউরোপ যাবার জন্য সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। ঠিক হল আমরা জলপথে পাড়ি দেব। যাত্রা করবার তখনও সাত দিন ছিল। সুতরাং প্রয়োজনীয় যা কিছু করবার তার জন্য প্রস্তুতি পর্বের করণীয় যা কিছু শুরু করে দিলাম।

মানুষ যা ভাবে সবসময় ঠিক তা ঘটে না। 'ঘটাইলে ঘটেনাকো অঘটনে ঘটে মুখের কথায় কি ঘটে!' এটা একজন মহাপুরুষের বাণী। এক অদৃশ্য মহাশক্তি মানুষকে ঘাড় ধরে কীভাবে পরিচালনা করে ভাবতেও অবাক হতে হয়। এস এস ভিকটোরিয়া নামে একটা ইটালিয়ান জাহাজের টিকিট কেনা

হয়ে গেল সকলের জন্য। মজার কথা প্রথম যখন উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ যাই সেটা ছিল এই জাহাজটি। তখন নাম ছিল এস এস গ্যানজেস। এখন খোল-নলচে পালটে হয়েছে ভিকটোরিয়া। একেবারে অতি আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

একটু আগে যে-কথাটা বললাম, 'মানুষ যা ভাবে এক অদৃশ্য মহাশক্তির প্রভাবে তার সব প্ল্যান ভেস্তে যায়।' আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যারা মৌখিক আনন্দে অভিনন্দন জানালেও, ঈর্ষার বশে কী করে আমার যাওয়াটাকে বানচাল করা যায় সেই চেষ্টায় উঠে-পড়ে লাগলেন। অবশ্য অতি গোপনে। অনেক গোপন গবেষণা করে একটা মারাত্মক ফন্দিও খাড়া করে ফেললেন। অবশ্য একটার বেশি ফন্দি খাটাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু কাজ ছিল স্টুডিয়োতে। ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। খানিকটা হেঁটে আসতে হয় ট্যাকসি ধরবার জন্য। জায়গাটা অন্ধকার, পিচবিহীন রাস্তা। দু'ধারে খানা। হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে সজোরে আসছে। রাস্তাটা যদিও বেশ চওড়া ছিল, আমি কিন্তু একধারে সরে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু গাড়িটা হঠাৎ সজোরে আমার ওপর এসে পড়ে আর কী। আমি লাফ দিয়ে খানার ভেতর না পড়লে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারত, অথবা হাড়গোড় ভাঙা হয়ে হাসপাতালের অতিথি হয়ে থাকতে হত। কিন্তু কার গাড়ি কে চালাচ্ছিল মোটেই বোঝা গেল না। যাই হোক, দুর্ঘটনা যখন এড়িয়ে যেতে পেরেছিলাম তখন ও-বিষয়ে আর চিন্তা করিনি। তবে বুঝতে পেরেছিলাম আমার বিদেশ যাত্রা স্থগিত রাখবার জন্য কেউ কেউ তৎপর হয়ে উঠেছে। যাই হোক, এর প্রমাণ আরও পাওয়া গেল দু'-তিনদিন পরে। কিছু নতুন জামা কাপড় তৈরি করিয়েছিলাম আর কিছু পরিধেয় কাচিয়ে রেখেছিলাম ঘরে একটা সুটকেসের ওপর। একজোড়া নতুন জুতোও কিনেছিলাম। বাইরে যখন বেরোতে হয় ঘরে চাবি দিয়ে যাই।

ঘনশ্যাম, দেবু আর আমি ছাড়া বাইরের আর কেউ ওখানে বসবাস করত না। একদিন বাইরে থেকে ফিরলাম রাত্রি দশটা নাগাদ। বাথরুমে মুখ-হাত ধুয়ে আসতে বোধহয় দশ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। মুখ-হাত ধোবার আগে যখন জামাকাপড় বদলেছিলাম তখন কিছু খুচরো টাকা-পয়সা বিছানার পাশেই একটা টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। রাত্রে শোবার আগে দরজা দুটো ভাল করে বন্ধ করেছিলাম। সকালে উঠে দরজা খুলে চাকরটাকে ডেকে পাঠালাম। তখনও আমার ঘুমের আমেজ কাটেনি, আবার শুয়ে পড়েছিলাম। চাকরটা আসতে তাকে সিগারেট আনতে বললাম এবং চোখ বুজিয়েই বললাম, টেবিলের ওপর পয়সাকড়ি আছে। সে কিন্তু জানাল পয়সাকড়ি কিছুই নেই। অগত্যা চোখ খুলে মাথা উঁচু করে দেখলাম সত্যিই কিছু নেই। ভাবলাম হয়তো অন্য কোথাও রেখেছি। সুতরাং তাকে বলতে হল, তুই নিয়ে আয় পরে পয়সা দেব এবং পুনরায় ঘুমের জাবর কাটতে লাগলাম। কিছু পরে চাকর সিগারেট এনে দিল। আমি চক্ষু অর্ধ নির্মীলিত করে সিগারেট ধরিয়ে পুনরায় চোখ বুজে ধূমপানে রত হলাম। তারপর যখন চা নিয়ে এল তখন ঘুম আপনা হতেই ছুটে গেল। টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই পয়সাকড়ির চিহ্ন নেই। আমার বেশ মনে ছিল কয়েকটা এক টাকার নোট আর কিছু খুচরো পকেট থেকে বের করে রেখেছিলাম। কে গ্যাঁড়া দিল। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। দেখি-না যে, কাচানো জামাকাপড়গুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দেবু ও ঘনশ্যামকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি দয়া করে আমার সঙ্গে রসিকতা করেছ? তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল এবং আমার ঘরে এসে সরজমিনে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করল। সবচাইতে কষ্ট অনুভব করলাম প্যারিসের তৈরি আমার অতি প্রিয় একটি ড্রেসিং গাউন ছিল, সেটিও উধাও। উদয়শঙ্করের আমলের ড্রেসিং গাউন। আমার অত্যন্ত গর্বের বস্তু ছিল। চক্ষু সজল হয়ে এল। আর কী গেছে

এদিক ওদিক দেখতে দেখলাম, নতুন জুতা জোড়াটাও অদৃশ্য হয়েছে। তবে একটা খবর পেয়েছিলাম যে, বাড়িওয়ালা আমাকে আটকাবে। কারণ কী? আমাদের প্রডিউসার দু'বছর আগে প্রায় তিনশো টাকার মতন বাড়ি ভাড়া দেয়নি। বাড়িওয়ালা পরদিন থেকে বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করবে, যাতে আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে সরে না পড়তে পারি। আমি কিন্তু সেই রাত্রেই আমার বড় সুটকেসে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় ভরে এবং আমার সরোদ যন্ত্রটি আফরোজার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার খালি হাতে বাইরে বেরুবার বাধা থাকবার কথা নয়। পরদিন সকাল থেকে দু'জন পাহারাদার বাড়ির একধারে এসে মোতায়েন রইল। আমি মনে মনে হাসলাম। তিন দিন বাদে আমাকে জাহাজে উঠতে হবে। কিন্তু একটা কিছু ফয়সালা না করে চোরের মতন পালাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বাড়িওয়ালাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, ওই বাকি টাকাগুলোর দায়িত্ব আমার নয়। তা ছাড়া আরও দু'জন ওই একই বাড়িতে বাস করছে তাদেরও দায়ী কর না কেন। আসলে এই প্যাঁচটা করেছিল আমার দুই সাথী দেবু ও ঘনশ্যাম। আমি যে ইউরোপ যাচ্ছি এটা তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। তারা নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে যাত্রার দিন এসে গেল। অতি প্রত্যুষে সেদিন উঠলাম। জানি আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। বাইরে এসে দেখি আরও দু'জন পাহারাদের এসে খুব জবর পাহারা দেবার জন্য প্রস্তুত। বেলা দশটা নাগাদ বাড়িওয়ালা এসে দেবুর ঘরে বসল। অর্থাৎ আমার কাছে টাকা আদায় না করা পর্যন্ত সেও বসে থাকবে। ক্রমে দেখলাম চেনাশুনো আরও অনেকে এসে হাজির। শেষ মুহূর্তে কী হয় দেখার আগ্রহ নিয়ে সব এসেছে। তার মানে ফাইনালে কে জেতে কে হারে।

জাহাজ ছাড়বার কথা বেলা দুটোয়। আমি আমার ঘরে বসে নির্বিকারচিত্তে বই পড়তে লাগলাম। কিন্তু মন আমার বইয়ে

ছিল না। ক্রমে বারোটা বাজবার উপক্রম হল। মনটা অস্থির হয়ে উঠল। কী করা যায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাড়ির খুব কাছেই এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি আফরোজার দলের একজন বিশিষ্ট মেম্বার। সে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে আমার অবস্থাটা খুলে বললাম। শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ একটা কাগজে উর্দুতে কিছু লিখে আমার হাতে দিলেন। কাগজ নিয়ে এসে আমি বাড়িওয়ালাকে দেখালাম। সে প্রথমে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আমাকে বলল, আপনাকে আমি আর আটকাতে পারি না আপনি যেতে পারেন। ঘনশ্যাম ও দেবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সময় খুব কম। ট্যাকসি আনতে ছুটলাম।

ইস্ট পায়ার যে জায়গা থেকে বিদেশি জাহাজ আসা-যাওয়া করে সেখানে আমি বহুবার গিয়েছি সমুদ্রবায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেশ দূরে। ট্যাকসিতে এক ঘণ্টা লাগে। ড্রাইভারকে অনুরোধ করলাম দ্রুত গাড়ি চালাতে। সেখানকার সব ট্যাক্সি বড় আমেরিকান গাড়ি, সুতরাং গতি যথাসম্ভব দ্রুতই হয়েছিল।

আমার পাসপোর্ট ও টিকিট আফরোজার সঙ্গেই ছিল। যখন জাহাজঘাটে হাজির হলাম তখন অবাক হয়ে দেখলাম, কোথাও কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না যে এইখান থেকে বিলাতগামী কোনও জাহাজ ছাড়ছে। কয়েকটি ছোটখাটো জাহাজ এদিক-ওদিক জলে ভাসছে বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনও একটি যে বিলাতগামী তার কোনও লক্ষণ বোঝা গেল না। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়লাম। কী ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এমন সময় কোনও একজন বড় জাহাজি অফিসারকে আসতে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মশায় ব্যাপার কী? ভিকটোরিয়া নামে জাহাজ ছাড়বার কথা কিন্তু কোথায় সে জাহাজটা।' তিনি আমার দিকে এমনভাবে চাইলেন যে, মনে হল এরকম মূর্খ জংলি লোক তিনি জীবনে কখনও দেখেনি। তিনি বললেন যে, মশায় এখানে কেন এসেছেন। সে-জাহাজ

তো ওয়েস্ট পায়ার থেকে ছাড়বে। তাকে লম্বা সেলাম করে ছুটলাম। আমার ট্যাকসি তখনও অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভারকে বললাম জলদি ওয়েস্ট পায়ার। ওয়েস্ট পায়ার দশ মাইলের কম তো হবেই না। গাড়ি যথাসম্ভব ছুটল সেদিকে। গাড়ির ভেতরে বসে আমার বুক ধড়ফড় করতে আরম্ভ করল। সাধারণত লোকে ট্রেন ফেল করে। কিন্তু আমাকে কি জাহাজ ফেল করতে হবে। ট্যাকসির ভেতর বোধহয় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। গাড়ি যখন থামল আমি স্বপ্নোত্থিতের মতন কোনও রকমে নেমে পড়লাম। লোকজন অনেক দেখলাম বটে, কিন্তু জাহাজের কোনও চিহ্ন নেই। অতিমাত্রায় ভীত হয়ে একজনকে শুধালাম ভিকটোরিয়া জাহাজ কোথায়। সে উলটে আমাকে প্রশ্ন করল, আপনি সেই জাহাজের যাত্রী? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। সে ভদ্রলোক এক অট্টহাসি হেসে বলল, আধ ঘণ্টা আগে সে-জাহাজ ছেড়ে গেছে। এমন সময় বড় অফিসার আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এসে আমার নাম জানতে চাইলেন। আমার নাম বলাতে তিনি বললেন, 'আপনি যদি দশ মিনিট আগে এসে যেতেন, তা হলে একটা মোটর বোটে আপনাকে জাহাজে পাঠাতে পারতাম। এখন আর হবে না।' জিজ্ঞাসা করলাম, যারা সি অফ করতে এসেছিলেন তারা কোথায়। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করে চলে গিয়েছেন মিনিট দশেক হল, তিনি এই কথা জানালেন। আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত। কাল তো আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। শেষকালে কিনা ইউরোপগামী জাহাজ ফেল করলাম। অগত্যা দিশাহারা হয়ে পুনরায় বাড়ি ফিরে এলাম। সকলে আমাকে দেখে অবাক। নানা ধরনের প্রশ্ন। বহুকষ্টে সেগুলির জবাব দিলাম। সেদিন খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। পরদিন আফরোজার দলের সেক্রেটারি মি. কাজমির অফিসে গেলাম। আমার সঙ্গে কেউ আর কথা বলতে চায় না। শেষকালে কাজমি জিজ্ঞাসা করল একটু ঠাট্টার সুরে, 'বলি কী ব্যাপার।' আমিই তাদের ঘাড়ে দোষ

চাপিয়ে বললাম, আপনারা এক বারও কি খবর নিয়েছিলেন আমাকে কীভাবে আটক রেখেছিল। সমস্ত ঘটনাটা বোঝালুম তাদের। কিন্তু তাদের মন গলাতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সরোদ ও সুটকেস কোথায়। শুনে অবাক হলাম সেগুলি আফরোজার সঙ্গে জাহাজে করে চলে গেছে। আমি তো অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে আমাকে পাঠাবার কোনও বন্দোবস্ত করতে পারেন। এর জবাব তাদের কাছে পাইনি। অর্থাৎ আমার আর যাবার দরকার নেই। সেখান থেকে আমি আর একজন বিশিষ্ট লোকের কাছে গেলাম। তিনি সাফ জবাব দিলেন, 'We have no sympathy with you.' আপনি যা ইচ্ছা করুন আমরা কিছু জানি না। সেখান থেকে চিফ কমিশনারের কাছে গেলাম। তিনি ভারত বিভাগের আগে থেকেই আমাকে জানতেন। দেখলাম তিনিও আমাকে আর পাত্তা দিতে চান না। বললেন, আপনাকে আর যেতে হবে না। আমিও গরম হয়ে উঠলাম। বললাম, আপনি দেখবেন আমি যে করেই হয় যাব। এই বলে তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন কোনও এক বিশেষ কাজে কাজমি রাশিয়ায় চলে গেলেন। সেই মুহূর্তে আমার ইউরোপ যাবার আশা-ভরসা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কাজমি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। যদিও তিনি আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তবুও তিনিই একমাত্র লোক ছিলেন যিনি সত্যই আমাকে ইউরোপ পাঠাতে পারতেন। আসলে তিনিই আমাকে ইউরোপ পাঠাবার মূলে ছিলেন। তবুও বলব, তিনি আমার ওপর রাগ করে কিছুমাত্র ব্যবস্থা না করেই রাশিয়া চলে গেলেন। আর একজন আমার বিশেষ বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল জলিল। এই ভদ্রলোকের বাড়িতে আমি বহুদিন বসবাস করেছি।

আমি বহু লোকের কাছে গিয়েছি, বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারিনি। সকলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। একদিন ওই জলিলই আমাকে বলল, তুমি শিক্ষা

মন্ত্রীর কাছে যাও। তিনি বাঙালি, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়তো তিনি করতে পারেন। তৎক্ষণাৎ আমি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য রওনা হলাম। তখন বেলা চারটে। তাঁর প্রথম সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম। বাঙালি বলে আমার নাম তিনি ভাল করেই জানতেন। তিনি আমাকে বিশেষ খাতির করে বসিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে জানালেন, পরদিন সকাল দশটার সময় আমি যেন আসি। তথাস্তু বলে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। আমার বাড়ি থেকে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের অফিস পাঁচ মাইল। বাসে বা স্কুটারে যেতে হয়। কিন্তু কী কারণ মনে নেই, পরদিন সব যানবাহনের ধর্মঘট ছিল। কিন্তু ধর্মঘট হলে আমার তো চলে না। অগত্যা পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় প্রস্তুত হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সাড়ে ন'টা নাগাদ আমি গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে মন্ত্রীমশায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। আমার নামের কার্ড পাঠিয়ে দিলাম এবং পাশের ঘরে আমাকে অপেক্ষা করবার অনুরোধ এল। সেই সময় সেক্রেটারি আমার কাছে জানতে চাইলেন, কী জন্য আমি এসেছি। আমি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলাম। আমার বক্তব্য শেষ হবার পর মুখ্যসচিব মহাশয় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এমন সময় শিক্ষামন্ত্রীর ঘর থেকে আমার ডাক এল। তাঁর ঘরে গিয়ে আদব জানালাম। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমার করমর্দন করে বসতে বললেন। তিনিও আমার নাম ভালভাবেই জানেন। যাই হোক, তাঁকেও আমার সমস্ত ঘটনা জানালাম। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাকে কী অপমানকর এক চিঠি দিয়েছেন সেটাও তাঁকে দেখালাম। তিনি আমাকে পরদিন আসতে বললেন। আমি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এলাম। বাইরে এসে মনে পড়ে গেল সেই অপমানকর চিঠিটা মন্ত্রীমশায়ের ঘরে ফেলে এসেছি। তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি মুখ্যসচিব কথা বলছেন। আমি ক্ষমা চেয়ে

চিঠিটা নিতে গেলাম। মন্ত্রীমহাশয় আমাকে আবার বসতে বললেন। তিনি বললেন 'হ্যামলেট উইদাউট দা প্রিন্স অফ ডেনমার্ক' হতেই পারে না। আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা এখনই করে দিচ্ছি। মুখ্যসচিব ফোন তুলে নিয়ে K.L.M.-কে জানালেন যে তিমিরবরণকে আপনাদের অফিসে পাঠাচ্ছি, আমস্টারডামের একটা প্রথম শ্রেণীর জায়গা করে দেবেন যখনই তিনি চান। আমি আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে তাঁদের বহুত বহুত ধন্যবাদ ও সেলাম জানিয়ে সোজা K.L.M. অফিসে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর টিকিট সংগ্রহ করে প্রায় নাচতে নাচতে জলিলের কাছে এসে সুখবরটা দিলাম। সেও খুব খুশি হয়ে দশ পাউন্ড বিদেশি মুদ্রার ব্যবস্থা করে দিল। আর এক ভদ্রলোক লতিফ যিনি সেই 'আনোখি' ছবির প্রডিউসার , তিনি আমাকে একশত টাকা দিলেন। সেদিন ছিল শনিবার, আমার যাত্রার দিন ছিল সোমবার।

সোমবার যথাসময়ে প্লেনে উঠলাম। সেদিন আর প্লেন ফেল করিনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ আমস্টারডাম পৌঁছে গেলাম। সময় লেগেছিল মাত্র আঠারো ঘণ্টা। মধ্যে এক বার অবতরণ করতে হয়েছিল সেই পৃথিবী বিখ্যাত চোরের রাজ্যে অর্থাৎ বাগদাদে। কিন্তু আমস্টারডামে কোথায় যে থাকব তার হদিস আমার জানা ছিল না। কারণ আমার জাহাজ ফেল কারণে দশ-দিন আগেই আমার দলের সকলেই জাহাজে রওনা হয়ে গেছে। আমার হিসাবে সেই দিনই আমাদের পার্টি ওখানে পৌঁছোবার কথা। কিন্তু থাকবার আস্তানা কোথায় ঠিক করা আছে, সে-খবর আমার জানবার কথা নয়। তবে আমাদের ইম্প্রেসারিও (Impresario) ডা. ব্লিকের (Dr. Blick) নাম আমার জানা ছিল। যথারীতি জিনিসপত্র সার্চ করাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এমনকী আমার ব্যাগও খুলতে হয়নি। আমাকে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সঙ্গে আপত্তিকর কিছু আছে কি না। আমি না বলাতে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস

করেছিল। ইংরাজি কথা বলেন এইরকম এক কাউন্টারে একজন মহিলা বসে ছিলেন সাহায্যকারিণী। তার কাছে আমি ডা. ব্লিকের নাম করাতে ওই মহিলা অনুসন্ধান শুরু করলেন টেলিফোনে। ডা. ব্লিক নামধারী আরও দু'-চারজন ছিলেন। অবশেষে আমি যাকে চাই সেই ঠিকানা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু শোনা গেল ডা. ব্লিক গেছেন লন্ডনে। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম, কিন্তু মহিলাটি আশ্বাস দিলেন ঘাবড়াবার কিছু নেই ব্লিকের সহকারীর ফোন নম্বর পেয়েছি। সহকারীর বাড়িতে ফোন করে জানা গেল তিনি ক্লাবে গেছেন। মহিলাটি ক্লাবে ফোন করে সহকারীকে পেলেন এবং জানতে পারলাম 'হোটেল আডভা'-য় আমাদের স্থান নির্ণয় করা আছে।

যন্ত্রমুগ্ধ

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন সংগীত কি আপনাদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে? সংগীত জগতে কিছুটা যে খ্যাতি অর্জন করেছি, তারই জন্য এই প্রশ্ন। তবে এই সুনাম যে কষ্টার্জিত, সেটা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না। তবে কিছু সুযোগ-সুবিধা আমি পেয়েছি। আর বংশগত মাত্র একটা সুদূর ক্ষীণ সূত্র আছে। বিখ্যাত যদুভট্ট ছিলেন আমার দিদিমার ভাই। তা ছাড়া জন্মাবধি সাংগীতিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। পাথুরেঘাটার রাজবংশীয় ঠাকুর পরিবার ছিলেন আমাদের পিতার মন্ত্রশিষ্য। ভারতের অনেক বিখ্যাত গায়ক ও বাদক প্রায়ই আসতেন রাজবাড়িতে। তখন গুরুবাড়িতে তাঁদের একবার করে পাঠানো হত। তখন কিছুই বোধগম্য হত না, কিন্তু কানে প্রবেশ করত। এইভাবেই আমার সংগীত জীবনের বীজ বপন করা হয়েছিল। কিন্তু এ-আলোচনা থাক। আসলে এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আমি কেন সরোদ হস্তগত করলাম এবং কীভাবে গুরু লাভ করলাম।

সরোদ ধরবার আগে ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে গুরু বিনাই আরও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। যেমন বাঁশি, এসরাজ, সেতার, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম গুরু বরণ করলাম ক্ল্যারিওনেটে। তখন কলকাতায় দু'জন বিখ্যাত বাজিয়ে ছিলেন। শ্রীরাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। দু'জনেই বহু দিন পরলোকে। আমি রাজেন্দ্রবাবুর কাছেই শিক্ষা শুরু করি। এ-যন্ত্রেও আমি কঠিন পরিশ্রম করে

সুনাম অর্জন করেছিলাম। অল্প বয়সে স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি এ-যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ক্ল্যারিওনেটে ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতেরই শিক্ষা পেয়েছিলাম। এই সময় গানও শিক্ষা করতাম স্বর্গীয় শ্রীরাধিকামোহন গোস্বামীর কাছ থেকে। যে-কোনও যন্ত্র শিখতে হলে গান শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তখনকার দিনে অনেক আসরেও আমার ডাক পড়ত। সেই সময়কার দৈনিক সংবাদপত্রেও ক্ল্যারিওনেট বাদক হিসাবে আমার নাম পাওয়া যাবে।

ক্ল্যারিওনেট ছাড়াও রাজেন্দ্রবাবু আর-একটি যন্ত্র বাজাতেন, সেটা হচ্ছে ব্যাঞ্জো। সুতরাং আমিও ওই যন্ত্র জোগাড় করে বাড়িতেই চর্চা শুরু করে দিলাম, রাজেন্দ্রবাবুর অগোচরে। আমার ক্ল্যারিওনেট বাজনা সম্বন্ধেও বেশ কিছু লেখা যায়। কিন্তু এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেটা নয়। সরোদ শিক্ষা করার সময়ও কয়েক বছর আমি ক্ল্যারিওনেট চর্চা বজায় রেখেছিলাম। কেন আমি সরোদ যন্ত্রটি বেছে নিলাম, কীভাবেই বা আমি গুরু লাভ করেছি এবং কারা উৎসাহ ও মঙ্গল কামনা করেছেন, সেটা না জানালে আমাকে অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে।

প্রথমেই সসম্ভ্রমে জানিয়ে রাখি যে, আমার সংগীত শিক্ষার শিরদাঁড়া ছিলেন আমার অগ্রজ শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য। তিনি না থাকলে আমি কোন বৃত্তি অবলম্বন করতাম তার ঠিক নেই। যদিও লেখাপড়া ও সংগীত একসঙ্গে চলছিল, কিন্তু দুটো একসঙ্গে চালাবার মতন সাংসারিক অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় গান্ধীজি সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন আমাকে ও ছোট ভাই শিশিরশোভনকে। মা সরস্বতীর কাগজ কলম ফেলে বীণাটাকেই আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু আত্মীয় গুরুজনেরা অত্যন্ত সচেষ্ট হলেন যাতে মা লক্ষ্মীর পিছনে ছুটি। এ-কথা ঠিক, সাংসারিক অনটন অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমার অগ্রজ সমস্ত উপেক্ষা করে যেন দুই পক্ষ বিস্তার

করে আগলে রেখে আমাদের দুই ভাইকে সংগীত শিক্ষার সমস্ত সুযোগ করে দিলেন। দাদা আমার চাইতে আট বছরের বড় এবং তখনকার দিনে সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছিলেন। তাঁর ওপর আর কোনও অভিভাবক ছিলেন না। পারিবারিক পরিকল্পনা তখন ছিল না। পূর্বেকার অভিভাবক অষ্টাদশেই দাদার বিবাহ দিয়েছিলেন। এক ছেলে ও দুই মেয়ে চার বছর পরে তখন নেহাত শিশু অবস্থায় ছিল। দাদার স্ত্রী ছাড়াও আরও কয়েকজন ছিলেন। সমস্ত দায়িত্ব দাদার ওপরে ছিল। কিন্তু সংসারের ঝঞ্ঝাট প্রসঙ্গ এখন থাক।

ব্যাঞ্জোর মেরামতির প্রয়োজন হলে আমাদের গলি থেকে বেরিয়েই চিৎপুর রোডের ওপরেই একটি ছোট দোকানে গোবর্ধন নামে এক কারিগরের কাছেই নিয়ে যেতাম। একদিন হঠাৎ সে বলে বসল, 'বাবু এ-সব বাজে যন্তর বাজিয়ে কোনও লাভ নেই। তার চাইতে সরোদ বাজান।' সরোদ? সেটা আবার কী বস্তু। সে তখন ভেতর থেকে অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য সুন্দর যন্ত্র এনে হাজির করল। বাঃ, এ যন্ত্র তো কখনও চোখে দেখিনি। শুনলাম যন্ত্রটা নাকি এক বিখ্যাত শিল্পীর, নাম হাফিজ আলি খাঁ। কই, এ নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। অবশ্য যন্ত্রটিই কখনও চোখে দেখিনি তো যন্ত্রীর নাম শুনব কোথা থেকে। বলে রাখা ভাল যে, তখন ১৯২০ সাল। তখনকার দিনে সংগীতপ্রিয় মহারাজা, রাজা, জমিদার ছাড়া সারা ভারতে খুব কম লোকেই ওই যন্ত্রটি চোখে দেখেছিলেন। তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। সারা ভারতে তখন মাত্র ছয়জন ওই যন্ত্র বাজাতেন। আর ওই ছয়জনই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রী। তাঁদের নাম হচ্ছে ফিদা হোসেন খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, আমির খাঁ ও করমতুল্লা খাঁ। ওইসব শিল্পীদের মধ্যে মাত্র গুরু আলাউদ্দিন খাঁ ও হাফিজ আলি খাঁ জীবিত আছেন। তবে সত্যকারের সরোদের ঘরানা বলতে মাত্র তিনজনের নাম করা যায়। হাফিজ আলি খাঁ ও

পরলোকগত আবদুল্লা খাঁ এবং তাঁর পুত্র আমির খাঁ। আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

গোবর্ধনের দোকানের সেই যন্ত্রটি একেবারে রেডি হয়েই ছিল। আঙুল দিয়ে কয়েকটি তারে টুংটাং করতেই মনে হল যেন আমার বুকের ভেতর শত শত বীণা বেজে উঠল। তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে দাদাকে ডেকে নিয়ে এলাম। তিনিও যন্ত্রটি দেখে অবাক। ওই যন্ত্রটি শেখবার ইচ্ছা দাদাকে জানালাম। দাদা চিন্তিত হয়ে বললেন, 'তা তো হল, কিন্তু শেখাবে কে!' গোবর্ধনই তার ফয়সালা করে দিল। কাছেই মেছোবাজারে এক বাজিয়ে আছেন, নাম আমির খাঁ। সে নিজেই খাঁ সাহেবকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবে। তা না হয় হল, কিন্তু যন্ত্রটি তৈরি করবে কে? হেসে গোবর্ধন জানাল, যন্ত্রটি তারই হাতের তৈরি এবং সে হাফিজ আলি খাঁ সাহেবের জন্য ওই রকম আরও যন্ত্র তৈরি করেছে। পরে খাঁ সাহেবের কাছে শুনেছি, ভারতে গোবর্ধনই সরোদের শ্রেষ্ঠ কারিগর। এই জন্য সুদূর গোয়ালিয়র থেকে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়। আর কোনও চিন্তার কারণ রইল না। তৎক্ষণাৎ সরোদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল। পরের দিনই গোবর্ধন সরোদের উপযুক্ত কাঠ কিনে নিয়ে এল। এরপর আমার কাজ হল দু' বেলা গোবর্ধনের দোকানে বসে থাকা। দিনের পর দিন প্রায় ছ' মাস মনের অস্থিরতা ও ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে ভ্রূণ অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ সদ্যোজাত যন্ত্রটি হাতে পেয়ে মনের যে কী অবস্থা হয়েছিল বোঝানো কঠিন। ইতিমধ্যে আমির খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে বেশ কয়েক মাস আগে। তিনিও মধ্যে মধ্যে গোবর্ধনের দোকানে আসতেন এবং যন্ত্রের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তিনিও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন যন্ত্রটি তৈরি করতে কারিগর এত দেরি করছে দেখে। অবশ্য কারিগরকে দোষ দেওয়া যায় না। একে বৃদ্ধ তার ওপর যন্ত্রটি নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত সে মনে কিছুতেই শান্তি পেত না।

এইবার আমার সরোদ শিক্ষা আরম্ভ হল আমাদের বাড়িতেই। যেহেতু কলকাতায় এমন কী সারা বাংলাদেশে (অবিভক্ত) আমির খাঁ সাহেবের আর কোনও শিষ্য ছিল না, সেই জন্য তাঁর সম্পূর্ণ মন, প্রাণ ও সময় আমার ওপরই কেন্দ্রীভূত হল। তাঁর নিজের যন্ত্রও আমাদের বাড়িতে এনে রাখলেন। এই যন্ত্রটিও বহু পুরনো এবং ঐতিহাসিক বলা চলে। পূর্বেই বলেছি, আমির খাঁ ছিলেন ঘরানা সরোদ বাজিয়ে। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন গোলাম আলি খাঁ। তাঁরই হাতের যন্ত্র ছিল এটি। গোলাম আলি খাঁর দুই পুত্র ছিলেন মোরাদ আলি খাঁ ও নান্নে খাঁ। মোরাদ আলি খাঁর পুত্র আবদুল্লা খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছিলেন আমির খাঁ। আর নান্নে খাঁর পুত্র এখনও জীবিত হাফিজ আলি খাঁ। ইনি বলেন, গোলাম আলি খাঁ ছিলেন সরোদের আবিষ্কারক। সংগীত ইতিহাসেও গোলাম আলি খাঁ ছাড়া সমসাময়িক বা তার পূর্বেকার আর কোনও সরোদ বাজিয়ের নাম পাওয়া যায় না। এখানে আমি জোর করে বলতে পারি ভারতে তারের যন্ত্রের মধ্যে সরোদই শ্রেষ্ঠ, তা যিনিই আবিষ্কার করে থাকুন। এই যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে রবাব যন্ত্র থেকে। রবাব দু' রকমের। কাবুলে যে রবাব চলন আছে, সেটা আকারে প্রায় সরোদেরই অনুরূপ। ভারতীয় রবাবের গঠন ভিন্ন প্রকার। এই দুই প্রকার রবাবের সংমিশ্রণে সরোদের সৃষ্টি। এ ছাড়া আর একটি যন্ত্রের সংমিশ্রণ এতে আছে। সেটা হচ্ছে সুরশৃঙ্গার। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় রবাব আর দেখাও যাবে না শোনাও যাবে না। ভারতের শেষ রবাব বাজিয়ে মহম্মদ হোসেন খাঁ বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে পরলোকগমন করেছেন। পুত্রের দিক থেকে তানসেন বংশের শেষ বংশধর ছিলেন। বলতে ভুলেছি, গুরু আমির খাঁর যন্ত্রটি তাঁর প্রপিতামহ গোলাম আলি খাঁর হাতের যন্ত্র ছিল। আধুনিক যুগের সরোদেরই পুরাতন সংস্করণ। আজকালকার সরোদের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য নেই। হাফিজ আলি খাঁ তাঁর ঘরানার

সরোদ কিছুটা তফাত ও উন্নততর ডিজাইন দিয়ে গোবর্ধনের দ্বারা তৈরি করান। পুত্র আমজাদ আলি গোবর্ধনেরই তৈরি যন্ত্র বাজাচ্ছেন। আমার যন্ত্রও সেই ডিজাইনের ছিল। যাই হোক, এবার আমার সরোদ শিক্ষা কীভাবে হয়েছিল, সেটাই বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

গোড়াতেই একটা কথা জানাতে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি কোথায় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির অতি কাছেই একটা অপরিচ্ছন্ন গলি, যার নাম শিবুঠাকুরের গলি। গলির দু' দিকের প্রবেশপথ ছিল অপ্রশস্ত। এই গলিতে মাত্র চার ঘর বাঙালি, বাকিগুলি বেশ ধনী অবাঙালিদের। আমাদের বাড়ির সামনেটা বেশ চওড়া এবং মনে হয় গলির শ্রেষ্ঠ জায়গায় ছিল। আমির খাঁ সাহেবের বাসস্থান ছিল কাছেই মেছোবাজারে, সুতরাং সেখান থেকে হেঁটে আসতে তাঁর কোনও অসুবিধা ছিল না।

সরোদ শিক্ষা আমার শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তবলা সঙ্গতের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। ঠিক ওইরকম চিন্তা না করেও আমাদের কনিষ্ঠ ভাইকে দাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক খলিফা আবেদ হোসেন খাঁর কাছে নাড়া বাঁধতে হল। আমাদের শ্রীহীরু গাঙ্গুলী তাঁরই শিষ্য এ-কথা বোধহয় সকলেই জানেন। সুতরাং আমার সঙ্গতের দুর্ভাবনা ছিল না। আমি যখন সরোদে কিছু অগ্রসর হয়েছিলাম, তখন কলকাতার বাঙালি তবলা বাদকেরা দলে দলে আমাদের বাড়ি আসতে শুরু করে দিলেন। তখনকার দিনে কলকাতায় তারের যন্ত্রী বিশেষ কেউ ছিলেন না। তবলা শিল্পীরা গানের সঙ্গে যদিও বাজাতেন, কিন্তু সেই একঘেঁয়ে ঠেকা ধরে বসে থাকা যন্ত্রণার হাত থেকে সঙ্গতের স্বাধীনতা পেতেও চাইতেন। সকাল থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত সর্বদাই তবলা সহযোগিতার সুযোগ পেয়েছি। ভবিষ্যতে লয়দার হিসাবে যে সুনাম অর্জন করেছি, তার অন্যতম কারণ বহু তবলা বাদকের

সহযোগিতা। এ ছাড়া ছোট ভাই শিশিরশোভনকে তো সর্বদাই পেতুম। কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হল, আমাদের দুই ভাইকে একই সঙ্গে সরোদ ও তবলা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব অগ্রজ শ্রীমিহিরকিরণ বিনা দ্বিধায় নিলেন হাসিমুখে। এই বিপজ্জনক সাংসারিক পরিস্থিতি তিনি যে সৃষ্টি করছেন, এর মধ্যে কোনওরূপ স্বার্থের গন্ধও ছিল না। আসল কারণ তিনি যে কত বড় সংগীতপ্রিয় ছিলেন, তারই প্রমাণ এগুলি।

সাধারণত ওস্তাদ সাগরেদকে শিক্ষা দিতে আসেন সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন এবং আধ ঘণ্টা বড়জোর এক ঘণ্টা শিক্ষা দিয়ে মাসান্তে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। আমার ক্ষেত্রে প্রায় শিক্ষা আরম্ভ করবার পর থেকেই ওরকম নিয়ম খাটল না। কিছুদিনের মধ্যেই যে নিয়মটা কায়েম হয়ে গেল সেটা হচ্ছে এই রকম। তিনি সাধারণত একবেলা আসতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সকালেও আসতেন। বিকেল পাঁচটার পরই তিনি আসতেন। এসেই যে শিক্ষা দিতে শুরু করতেন, তা নয়। তাঁর খিদমত ও তোয়াজের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে উঠতাম। তাঁর জন্য একটা গড়গড়া এনে রেখেছিলাম। ফৌজদারি বালাখানার তামাক এনে রাখতে হত। একটি অতি বৃহৎ কলকেতে প্রায় এক পোয়া তামাকে, তাওয়া দিয়ে সেজে অগ্নিসংযোগ করে ভাল করে ধরিয়ে খাঁ সাহেবকে দিতাম। কম করেও চার ঘণ্টা তিনি ওই তাম্রকূট সেবন করতেন। এ ছাড়া চা ও পান ছিল। শিক্ষার কোনও নির্দিষ্ট সময় বাঁধা ছিল না। তিনি সাধারণত রাত দশটা পর্যন্ত থাকতেন, কোনও কোনও দিন আরও বেশি রাত হয়ে যেত। সপ্তাহে একদিন দু'দিন নয়, প্রতি দিনই তিনি আসতেন। আমরা তিন ভাই ছাড়াও আরও কয়েকজন নিত্যকার এই আসরে হাজির থাকতেন। এর মধ্যে পাড়ার কয়েকজন অবাঙালি রোজ এসে বসতেন। ক্রমে আমাদের বাড়ির মাঝারি মাপের বৈঠকখানাটা কলকাতার মধ্যে সংগীতের একটা পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে

লাগল। আমার শিক্ষা রোজ যথা নিয়মে চলত, এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে বিশেষ আসর বসত। তখনকার দিনের কলকাতার বহু বিখ্যাত গায়ক-বাদকেরাও এখানে এসে গানবাজনা করতেন। শিবুঠাকুর গলির ৩১ নং বাড়ি কলকাতার সংগীতরসিকদের মধ্যে বেশ চিত্তাকর্ষক স্থান হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাদের বৈঠকখানাটি সর্বদাই সংগীতের আবহাওয়ায় ঠাসা হয়ে রইল। শুধু কলকাতা থেকেই নয়, বাইরে থেকেও বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে কোনও সংগীতশিল্পী কলকাতায় এলে কোনও না কোনও পরিচিতের মাধ্যমে আমাদের বাড়ি আসত্তেন এবং তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সংগীত পরিবেশন করতেন। কলকাতায় এখনও অনেক নামকরা শিল্পী আছেন, যাঁরা দু'বেলাই কেবলমাত্র সংগীতের আকর্ষণেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। এমন অনেক বিশিষ্ট লোক আসতেন, যাঁদের সদিচ্ছা, সৎ পরামর্শ ও সহানুভূতি আমাকে যে-প্রেরণা জুগিয়েছে তা আমার শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি। ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীত তখনকার দিনে জনসাধারণ মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। বুদ্ধিজীবী ও অভিজাতদের মধ্যেই বিশেষ সমাদৃত ছিল। তাঁরা কেবলমাত্র সংগীত শুনেই তৃপ্ত হতেন তা নয়, বিচার বিশ্লেষণ করতেন। এর দ্বারা আমারই উপকার হয়েছে বেশি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নেই। আমি বিনা অনুমতিতে কয়েকর্জনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ করছি, আশা করি তাঁরা রুষ্ট হবেন না। সকলেই যে একদিনে একসঙ্গে আসতেন তা নয়। তবে কয়েকজন আসতেন বেশ দলবল নিয়ে। যেমন শ্রীদিলীপকুমার রায় (মন্টুদা), কাজী নজরুল ইসলাম, লক্ষ্ণৌ থেকে কবি অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীধূর্জটি মুখোপাধ্যায়। এঁরা বেশিরভাগ সময় একসঙ্গেই আসতেন। তারপর সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক ড. সত্যেন বোস, জাতীয় অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর একজন দলবল নিয়ে আসতেন

সহযোগিতা। এ ছাড়া ছোট ভাই শিশিরশোভনকে তো সর্বদাই পেতুম। কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হল, আমাদের দুই ভাইকে একই সঙ্গে সরোদ ও তবলা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব অগ্রজ শ্রীমিহিরকিরণ বিনা দ্বিধায় নিলেন হাসিমুখে। এই বিপজ্জনক সাংসারিক পরিস্থিতি তিনি যে সৃষ্টি করছেন, এর মধ্যে কোনওরূপ স্বার্থের গন্ধও ছিল না। আসল কারণ তিনি যে কত বড় সংগীতপ্রিয় ছিলেন, তারই প্রমাণ এগুলি।

সাধারণত ওস্তাদ সাগরেদকে শিক্ষা দিতে আসেন সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন এবং আধ ঘণ্টা বড়জোর এক ঘণ্টা শিক্ষা দিয়ে মাসান্তে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। আমার ক্ষেত্রে প্রায় শিক্ষা আরম্ভ করবার পর থেকেই ওরকম নিয়ম খাটল না। কিছুদিনের মধ্যেই যে নিয়মটা কায়েম হয়ে গেল সেটা হচ্ছে এই রকম। তিনি সাধারণত একবেলা আসতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সকালেও আসতেন। বিকেল পাঁচটার পরই তিনি আসতেন। এসেই যে শিক্ষা দিতে শুরু করতেন, তা নয়। তাঁর খিদমত ও তোয়াজের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে উঠতাম। তাঁর জন্য একটা গড়গড়া এনে রেখেছিলাম। ফৌজদারি বালাখানার তামাক এনে রাখতে হত। একটি অতি বৃহৎ কলকেতে প্রায় এক পোয়া তামাকে, তাওয়া দিয়ে সেজে অগ্নিসংযোগ করে ভাল করে ধরিয়ে খাঁ সাহেবকে দিতাম। কম করেও চার ঘণ্টা তিনি ওই তাম্রকূট সেবন করতেন। এ ছাড়া চা ও পান ছিল। শিক্ষার কোনও নির্দিষ্ট সময় বাঁধা ছিল না। তিনি সাধারণত রাত দশটা পর্যন্ত থাকতেন, কোনও কোনও দিন আরও বেশি রাত হয়ে যেত। সপ্তাহে একদিন দু'দিন নয়, প্রতি দিনই তিনি আসতেন। আমরা তিন ভাই ছাড়াও আরও কয়েকজন নিত্যকার এই আসরে হাজির থাকতেন। এর মধ্যে পাড়ার কয়েকজন অবাঙালি রোজ এসে বসতেন। ক্রমে আমাদের বাড়ির মাঝারি মাপের বৈঠকখানাটা কলকাতার মধ্যে সংগীতের একটা পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে

লাগল। আমার শিক্ষা রোজ যথা নিয়মে চলত, এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে বিশেষ আসর বসত। তখনকার দিনের কলকাতার বহু বিখ্যাত গায়ক-বাদকেরাও এখানে এসে গানবাজনা করতেন। শিবুঠাকুর গলির ৩১ নং বাড়ি কলকাতার সংগীতরসিকদের মধ্যে বেশ চিত্তাকর্ষক স্থান হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাদের বৈঠকখানাটি সর্বদাই সংগীতের আবহাওয়ায় ঠাসা হয়ে রইল। শুধু কলকাতা থেকেই নয়, বাইরে থেকেও বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে কোনও সংগীতশিল্পী কলকাতায় এলে কোনও না কোনও পরিচিতের মাধ্যমে আমাদের বাড়ি আসত্তেন এবং তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সংগীত পরিবেশন করতেন। কলকাতায় এখনও অনেক নামকরা শিল্পী আছেন, যাঁরা দু'বেলাই কেবলমাত্র সংগীতের আকর্ষণেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। এমন অনেক বিশিষ্ট লোক আসতেন, যাঁদের সদিচ্ছা, সৎ পরামর্শ ও সহানুভূতি আমাকে যে-প্রেরণা জুগিয়েছে তা আমার শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি। ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীত তখনকার দিনে জনসাধারণ মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। বুদ্ধিজীবী ও অভিজাতদের মধ্যেই বিশেষ সমাদৃত ছিল। তাঁরা কেবলমাত্র সংগীত শুনেই তৃপ্ত হতেন তা নয়, বিচার বিশ্লেষণ করতেন। এর দ্বারা আমারই উপকার হয়েছে বেশি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নেই। আমি বিনা অনুমতিতে কয়েকজঁনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ করছি, আশা করি তাঁরা রুষ্ট হবেন না। সকলেই যে একদিনে একসঙ্গে আসতেন তা নয়। তবে কয়েকজন আসতেন বেশ দলবল নিয়ে। যেমন শ্রীদিলীপকুমার রায় (মন্টুদা), কাজী নজরুল ইসলাম, লক্ষ্ণৌ থেকে কবি অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীধূর্জটি মুখোপাধ্যায়। এঁরা বেশিরভাগ সময় একসঙ্গেই আসতেন। তারপর সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক ড. সত্যেন বোস, জাতীয় অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর একজন দলবল নিয়ে আসতেন

যাঁর দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি, তিনি হচ্ছেন ড. অমিয় সান্যাল। সংগীত জগতে ইনি বিশেষ পরিচিত। ইনি নিজে যেমন চমৎকার গাইতেন তেমনি সংগীতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রায় অসাধারণ ছিলেন। তাঁর সাহায্যে সংগীতের বহু জটিল রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ড. সান্যালের প্রধান গুণ ছিল উদীয়মান যে-কোনও শিক্ষার্থীর বাড়ি গিয়ে তাকে উৎসাহ দেওয়া। আমীর খাঁর কাছে শিক্ষার প্রায় শুরু থেকেই ইনি আমাদের বাড়ি আসতেন। ওপরে বাকি যাঁদের নাম করলাম তাঁরা আসতে আরম্ভ করেছিলেন যখন আমি মাইহারে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা করতুম। বছরে এক বার এক মাসের জন্য আসতুম, সেই সময়েই তাঁরা আসতেন।

অসমাপ্ত পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয়। চিরকালই হিন্দু বা মুসলমান নিজ বংশের বাইরে অকপটে কাউকে শিক্ষা দিতেন না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং আমার ওপর অসাধারণ স্নেহ ও ভালবাসার দরুন আমার গুরু কিছুই আমাকে গোপন করেননি। আর একটা বিশেষ কারণ ছিল সেটা আগে জানতুম না এবং সেটা আমার নিজের বলা উচিত নয় তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ এ-কথাটা আমার হয়ে কেউ বলবার নেই। সেটা হচ্ছে আমার অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য ও রেওয়াজ করবার ক্ষমতা। এখনও যে নেই তা নয়। এ ছাড়া রোজ আমাদের বাড়ি না এলে তাঁর ঘুম হত না। শুধু তাই নয়, বর্ষাকালে অতিবর্ষণের ফলে কলকাতার প্রায় সব জায়গায় জল জমে যায়। আমাদের গলিতেও হাঁটুর ওপর জল দাঁড়াত। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আজ খাঁ সাহেব কিছুতেই আসতে পারবেন না। কিন্তু আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখতে পেলাম তিনি হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে ছপছপ করে আসছেন। সাধারণত তিনি চুড়িদার পাজামা পরতেন, জলের দরুন লুঙ্গি পরতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমরা প্রশ্ন করলাম কেন এই দুর্যোগে এলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এমন দিনে বাড়িতে বসে থাকা

অস্বস্তিকর, তা ছাড়া এই তো সাংগীতিক আবহাওয়া। আজকে কি না-এসে থাকা যায়, যতই দুর্যোগ আসুক। আমি খুশিই হয়েছিলাম, কারণ এরকম আবহাওয়া আমার কাছে চিরদিনই অতিপ্রিয়। যাই হোক, এইভাবে পাঁচটা বছর আমাকে তিনি পুত্রের মতন স্নেহ ভালবাসা দিয়ে অকপটে শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন। একদিনের কথা মনে আছে, সেটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। ভারতে সরোদের শ্রেষ্ঠ ঘরানার বাজিয়ে হয়েও তাঁর মতামত কী রকম উদার ছিল এটা তারই নমুনা। মনে আছে ১৯২৪ সালে লক্ষৌয়ে যখন প্রথম অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স হয় তখন বিচারে সরোদ বাজনায় প্রথম হন ফিদা হোসেন খাঁ এবং আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে দ্বিতীয় বলে ঘোষণা করা হয়। এই খবর শোনা মাত্রই আমীর খাঁ সাহেব প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলেছিলেন, 'কোন বেয়াকুফ এই বিচার করল। আলাউদ্দিনের মতন সরোদ বাজিয়ে সারা ভারতে নেই।' তখন আমরা তাঁর নামই শুনেছিলাম বাজনা তখনও শুনিনি। তাঁর মতো বিখ্যাত ঘরানার বিখ্যাত বাজিয়ে হয়েও অন্য ঘরানার নিজ প্রফেশনের শিল্পীকে এ ধরনের প্রশংসা বিশেষত সংগীত জগতে বিরল। যাই হোক, পাঁচ বছর ধরে এইভাবে শিক্ষা পেয়ে আসছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কেন সে-কথা পরে বলছি।

আজকালকার দিনের শিল্পীরা হয়তো ভাবতে পারেন ওস্তাদ পাঁচ বছর ধরে কী ধরনের শিক্ষা দিলেন। নিশ্চয় শিষ্যকে ধোঁকা দিয়ে ব্যক্তিগত কারণে কালহরণ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের দোষারোপ আমীর খাঁ সাহেবের কোনও শত্রুও কখনও দেননি। তিনি ছিলেন উদার এবং তাঁর সংগীতের লোহার সিন্দুকে অগাধ সম্পত্তি ছিল। তা ছাড়া আমি এতই নির্বোধ ছিলাম না যে, যদি তিনি ফাঁকি দিতেন বা গোপন করতেন তো আমার বোধগম্য হত না। এ ছাড়া আমার শিক্ষার সময় বহু গুণী মাঝে মাঝে

উপস্থিত থাকতেন যাঁরা খাঁ সাহেবের উদারতায় মুগ্ধ হতেন। তিনি আমাকে কী ধরনের এবং কী পরিমাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন একমাত্র আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানতে পারেন না। ভেজাল বিহীন জাত ঘরানার সংগীত কী হতে পারে আমার এত বৎসরের অভিজ্ঞতার ওপর সে-সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা যায়। সরোদের ওপর একটা রাগের ঘরানা আলাপের পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। বিলম্বিত দিয়ে শুরু করে ধাপে ধাপে স্থায়ী থেকে শুরু করে অন্তরা সঞ্চারি আভোগ, তারপর জোড় তান ইত্যাদির সঙ্গে রবাব, বীণ ও সরোদের যে বিশেষ কয়েকটি ক্রিয়া আছে যেমন লরি, লড়ন্ত, লড়গুথাও, ঝালা, ঠোকঝালা, ইত্যাদি ছাড়াও ঘরানার যে-সব গৎ শিক্ষা করেছিলাম আমীর খাঁ সাহেবের কাছ থেকে পাঁচ বছর ধরে, সেগুলি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারপর হঠাৎ কেন ওলট-পালট হয়ে গেল সেটাই বলছি।

কলকাতায় যেখানে যত ছোট বড় গান-বাজনার আসর হত আমরা তিন ভাই একত্রে উপস্থিত থাকতুম। নিমন্ত্রিত কি অনিমন্ত্রিত সে-প্রশ্নই আমাদের মনে স্থান পেত না। এই রকম এক আসর বসেছিল স্বর্গীয় শ্রীশীতল মুখার্জির বাড়িতে। যথারীতি আমরা তিন ভাই হাজির ছিলাম। অনেক কিছু হবার পর সরোদ নিয়ে বসলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। সেদিন যা শুনলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। সরোদ বাজনা যে এরকম হতে পারে ধারণাই ছিল না। হাফেজ আলি ও করমতুল্লার বাজনাও বহু বার শুনেছি কিন্তু এই বাজনা এক বিচিত্র জাতের। মনে মনে ভাবলাম এত বৎসর যা শিখেছি তার তুলনা নেই, আমার কাছে তা অমূল্য সম্পদ, কিন্তু সেদিন যা শুনলাম তা ছিল আমার ধারণার বাইরে। মনে মনে ভাবলাম এই জিনিস যদি শিখে আয়ত্ত করতে পারি তা হলে এই দুই ঘরানার বাজনা একত্রে আমাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সরোদবাদক করে তুলতে পারে। সেই মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেললাম এবং

দাদাকে আমার মনের ইচ্ছা জানালাম। তিনি সম্মতি দিলেন। শুভস্য শীঘ্রম, সুতরাং তৎক্ষণাৎ খাঁ সাহেবকে ধরে বসলাম যে, আমাকে শিষ্য করতে হবে। শিষ্য তিনি আমায় করেছিলেন এটা ঠিক, কিন্তু সেটা এক কথায় হয়নি। যার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে দু' মাস কলকাতায় আটক থাকতে হয়। সে আর-এক কাহিনী। আপাতত জানিয়ে রাখি যে, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শিষ্য হয়ে আরও পাঁচটা বছর মাইহারে থেকে শিক্ষা করেছিলাম। সেখানেও তাঁর মন জয় করার দরুন আজও আমাকে তিনি তাঁর প্রথম পুত্র বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

আমি ও আমার সুরের জগৎ

যেখানে আমার জন্মস্থান ছিল, সেটা কলকাতা বড়বাজারের কাছে শিবু ঠাকুরের গলি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাড়ির খুব কাছে। ওখান থেকে দু' মিনিটের রাস্তা। ওখানেই আমাদের জন্ম, ওখানেই বড় হয়েছি এবং বহু বছর ওখানে থেকেছি, ছেড়েছি অনেক পরে। ওখান থেকেই বিলেত গেছি। অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছি।

আমরা গুরুবংশ, তিনপুরুষে তান্ত্রিক।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল আমাদের। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এঁরা আমাদের বাবার ঠাকুরদার শিষ্য ছিলেন। এই সূত্রেই আমার এই বাড়িতে যাওয়া-আসা। অনেকেই জানেন, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির সৌরীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রমোহন বিদগ্ধ সংগীতরসিক ছিলেন। তখনকার দিনে বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা ওই বাড়িতে এসে গান করতেন। আর সেখান থেকে তাঁদের আমাদের বাড়িতে আনা হত গুরুকে গানবাজনা শোনাবার জন্য। আমার বাবার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। দুপুরবেলা মেয়েরা (শিষ্যারা) ওবাড়ি থেকে আসতেন গান শুনতে। আমরা তিনভাই। বড়ভাই মিহিরকিরণ, আমি তিমিরবরণ ও ছোটভাই শিশিরশোভন। ছোটবেলা থেকেই, মনে নেই কবে থেকে, আমি ভাল গান গাইতে পারতাম। ঠাকুরবাড়ি থেকে যে-সব মহিলারা (শিষ্যারা) আমাদের বাড়িতে আসতেন, তাঁরা আমাকে ডেকে গান শুনতেন। ভক্তিমূলক গান আমি গাইতাম

আর আমার দাদারা সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাতেন। একটা গান আমার মনে পড়ছে—"এস মা, এস মা উমা" এ ছাড়া যে-সব ওস্তাদরা আমাদের বাড়ি ও ঠাকুরবাড়িতে আসতেন, তাঁদের গানও আমি গাইতাম। শিষ্যারা আমার গান শুনে অনেকসময় চোখের জলও ফেলতেন। আমি কিন্তু কোথাও গান শিখিনি। বাড়ির সাংগীতিক আবহাওয়া থেকে যা কিছু পাওয়া। আমার বাবা খুব গানবাজনা ভালবাসতেন। আমাদের বাড়িতে বছরে একবার-দু'বার ছাদে ত্রিপল টাঙিয়ে উৎসব হত, পূজা হত, শিষ্যদের জন্য। সেখানে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলে একজন আসতেন, তিনি ঠাকুরবাড়ির জামাই ছিলেন, ভাল গান গাইতেন। আর একজন ছিলেন, নগেন্দ্রনাথ দেব, তিনি খুব ভাল পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। তিনি হচ্ছেন কবি, লেখক নরেন্দ্র দেব-এর বাবা। ছাদে ত্রিপল টাঙিয়ে গানের আসরও বসত, এরপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। প্রায় সারারাত কেটে যেত। এই আসরে আশুবাবু গাইতেন, আমাকেও অনেকসময় ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত গান গাওয়ার জন্য। তখন আমার আট-দশ বছর বয়েস। তখন স্কুলে পড়ি। গানবাজনার শখটা আমার ওখান থেকেই আসে। পড়াশুনার সঙ্গে গানবাজনাটাও চলত।

যন্ত্রসংগীতে প্রথম আকৃষ্ট হই রেকর্ড শুনে। তখনকার দিনের বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ড শুনে। দশ বছর বয়স থেকেই আমি রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ক্ল্যারিওনেট শিখতে শুরু করি। উনি ব্যাঞ্জোও বাজাতে পারতেন। তার দেখাদেখি আমিও একটা ব্যাঞ্জো কিনে বাড়িতে বাজানো অভ্যাস করতে থাকি। আমি ব্যাঞ্জো সারাতে মাঝে মাঝে আমার বাড়ির পাশে একটি দোকানে যেতাম। গোবর্ধন মিস্ত্রির দোকান ছিল এটি। এই গোবর্ধন ভারতবিখ্যাত ছিলেন সরোদের মিস্ত্রি হিসাবে। এখানে বিখ্যাত সরোদিয়া হাফেজ আলি খাঁ আসতেন গোয়ালিয়র

থেকে যন্ত্র তৈরি করাতে এবং সারাতে। তখন গোবর্ধন মিস্ত্রি বললেন—এ-সব ব্যাঞ্জোট্যাঞ্জো শিখে কী হবে? সরোদ শিখুন। হাফেজ আলি খাঁকে আমি ওই দোকানেই দেখি, তখন সরোদ যন্ত্রটা কলকাতাতে প্রায় ছিলই না, দেখিওনি কখনও। গোবর্ধন মিস্ত্রি আমাকে ওই কথা বলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম—সেটা আবার কী যন্ত্র? সেই সময়ে হাফেজ আলি খাঁর একটি সরোদ ওই দোকানে ছিল, আমি বলার পর গোবর্ধন মিস্ত্রি যন্ত্রটি আমাকে দেখালেন এবং একটু বাজালেন। যন্ত্রের চেহারা দেখে এবং আওয়াজ শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আওয়াজ শুনে আমার বুকের মধ্যে ঝড় উঠে গেল। আমার এত শেখার ইচ্ছা হল যে, আমি আমার বড়ভাই মিহিরকিরণকে বললাম, আমি এই যন্ত্র শিখতে চাই। শেখার ব্যাপারে আমাকে প্রথম সাহায্য করেছিলেন গোবর্ধন মিস্ত্রি। আমার সরোদ-শিক্ষার প্রথম গুরু ছিলেন আমীর খাঁ। ইনি মেছুয়াবাজারে থাকতেন। এই আমীর খাঁ-রা তিনপুরুষ ধরে সরোদিয়া ছিলেন। কোন ঘরানা ছিলেন আমার ঠিক মনে নেই। এই ঘরানার প্রথম পুরুষ মোরাদ আলি খাঁ, তাঁর ছেলে আবদুল্লা খাঁ, এই আবদুল্লা খাঁর ছেলে ছিলেন আমীর খাঁ। কথা ছিল, তিনি সপ্তাহে দু' দিন করে আসবেন আমাকে শেখাতে, কিন্তু পরে আমাদের বাড়ির প্রতি এত আকৃষ্ট হলেন যে, প্রায় রোজই আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে তাঁর মেলামেশাটা ছিল ঘরোয়া। তাঁর সরোদটি আমাদের বাড়িতেই থাকত। গল্পগুজবও করতেন, শিক্ষাও দিতেন—টাকা পয়সার ব্যাপারটা ছিল গৌণ। এইভাবে তাঁর কাছে পাঁচ বছর আমি শিখেছি।

আমার ভাইবোনেরা সকলেই গান গাইতে পারতেন। তবে আমার ছোটভাই তবলা বাজাতেন। আমার সরোদের সঙ্গে সঙ্গত করার জন্যই তবলাটা শিখেছিলেন প্রধানত, যার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য অন্য কোনও তবলিয়া রাখতে হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, আমার গানবাজনার প্রেরণাস্থল

কেবলমাত্র আমার বাড়িই ছিল না, সেই সঙ্গে আমার সেই পাঁচ-সাত বছর বয়সের ঠাকুরবাড়ির সংগীতের আসরগুলিও আমার মনে সংগীতের প্রভাব ফেলেছিল।

সম্ভবত, ১৯২৪ সালে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে লখনৌতে প্রথম সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে সমস্ত বড় বড় ওস্তাদরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁও এসেছিলেন—যাঁর কাছে পরে আমি শিক্ষাগ্রহণ করেছি। সরোদে আলাউদ্দিন খাঁকে প্রথম করা হয়নি, প্রথম হয়েছিলেন ফিদা হুসেন খাঁ, দ্বিতীয় হয়েছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ এবং সেতারে প্রথম হয়েছিলেন ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ (বিলায়েৎ খাঁর বাবা)। এই সম্মেলনে আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর বিখ্যাত 'মাইহার ব্যান্ড' পরিবেশন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কর্তৃপক্ষ প্রথমে আপত্তি করলেও পরে রাজি হয়েছিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তিনি এখানে ব্যান্ড বাজিয়ে শোনান এবং শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন।

এই মাইহার ব্যান্ডকেই প্রথম India Concert বলা চলে। আগে যা ছিল, তা হচ্ছে ঐক্যতানবাদন অর্থাৎ সব যন্ত্রই একই সুরে বাজানো হত। আলাউদ্দিন খাঁ-র দ্বিতীয় হবার খবরটি যখন কলকাতায় পৌঁছয় তখন আমীর খাঁ আমার বাড়িতে বসে—তিনি শুনে বললেন—'বিচারটা তো ঠিক হল না, আলাউদ্দিনকেই প্রথম করা উচিত ছিল। ওর মতো বাজিয়ে নেই।' এরপর ১৯২৫ সালে তখনকার নামকরা এসরাজ বাজিয়ে শীতল মুখোপাধ্যায়ের কলকাতার বাড়িতে এসে ওঠেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এবং এখানেই আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। শুনেছি এই শীতল মুখোপাধ্যায় এবং আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আলাউদ্দিন ক্ল্যারিওনেটও বাজাতেন, তবে সরোদ ছিল ওঁর সবথেকে প্রিয় যন্ত্র। শীতলবাবুর বাড়িতে প্রথম ওঁর বাজনা আমি শুনি এবং মুগ্ধ হয়ে যাই। তখনই ওঁর কাছে

শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করি। উনি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। উনি বললেন, 'আমি থাকি মাইহারে মধ্যপ্রদেশে—এই অবস্থায় আমি তোমাকে কী করে শেখাব?' আমি বললাম, 'বেশ তো মাইহারে গিয়েই আমি শিখব।' তখন উনি আমার বাজনা শুনতে চাইলেন। পরের দিন আমি শীতলবাবুর বাড়িতে ওঁকে সরোদ বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম। তখন আমি প্রতিদিন প্রায় আঠারো ঘণ্টা রেওয়াজ করতাম। আমার তখন থেকেই মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা ছিল আমি বড় হব। আমার বাজনা শুনে উনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু আমাকে শেখাতে রাজি হননি কারণ উনি বলেছিলেন, যিনি তোমাকে আগে শিখিয়েছেন তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই শিখিয়েছেন। তাঁর অভিশাপ আমি কুড়োতে চাই না। তা সত্ত্বেও যখন আমি ওঁর কাছে শেখার জন্য জোর করি তখন উনি বলেন আমীর খাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। আমীর খাঁর সঙ্গে ওঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আমীর খাঁ রাজি হয়েছিলেন তবে এ-কথা বলেছিলেন যে, উনি যা শিখিয়েছেন, তা একেবারে সব ভুলে যেতে হবে। উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন একটু। মাইহারে থাকলেও আলাউদ্দিন খাঁ ওই সময় মাঝে মাঝে গৌরীপুরের রাজা বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতেও এসে থাকতেন কলকাতায়। আমিও ওই সময় ওই বাড়িতে যাওয়া-আসা করতাম এবং বার বার অনুরোধ করতাম আমাকে শেখানোর জন্য। কিন্তু আমার কথায় আমল দিতেন না। শেষ পর্যন্ত মহারাজা বললেন—'ভাল বংশের ছেলে, ওকে আপনি শেখান।' ওতেই কাজ হল। উনি আমাকে শেখাতে রাজি হলেন। প্রায় মাসাধিক কাল কলকাতায় থাকার পর আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব মাইহারে ফিরে যাবার সময়ই আমি তাঁর সঙ্গে সেখানে চলে গেলাম। প্রায় পাঁচ বছর ওঁর কাছে থেকে আমি সরোদে শিক্ষালাভ করি।

এরপর ১৯৩০ সালে আমি কলকাতা ফিরে আসি। মাইহারে থাকাকালীন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের তৈরি 'মাইহার ব্যান্ড'

আমাকে Concert তৈরি করার অনুপ্রেরণা জোগায়। এর ফলে কলকাতা এসেই আমি বাড়িতে আমার দাদা, ভাই, ভাগনে, ভাগনি সবাইকে নিয়ে একটি Concert Party তৈরি করি।

এই সময় হরেন ঘোষ নামে এক প্রখ্যাত গাড়ি-ব্যবসায়ী কলকাতায় বহু বড় বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তিনিই প্রথম কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে উদয়শঙ্করকে পরিচিত করান। তখন উদয়শঙ্করের নাচ সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। কারণ তখনকার দিনের প্রখ্যাত কত্থক নাচিয়ে যেমন, শম্ভু মহারাজ, আচ্ছান প্রমুখদের নাচ দেখেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। হরেনবাবুর কথাতেই আমি উদয়শঙ্করের অনুষ্ঠান দেখতে যাই। উদয়শঙ্করের সঙ্গে সে সময় এক সুইস মহিলা ছিলেন, যাঁর নাম অ্যালিস কোনার।

এ ছাড়াও উদয়শঙ্করের নাচের সঙ্গে সে সময় দু'জন ইংরেজ পিয়ানো ও বেহালা বাজাতেন। এদের নাম ছিল বেনটেল্ ম্যান ব্রাদার্স। যাই হোক, উদয়শঙ্করের সেই নাচের অনুষ্ঠান দেখে আমার নাচ সম্বন্ধে ধারণা পালটে গিয়েছিল। নাচ যে এত সুন্দর হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। সেখানেই উদয়শঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং আমি তাঁকে আমার তৈরি অর্কেস্ট্রা (যা আমি আমার বাড়ির সবাইকে নিয়ে তৈরি করেছিলাম) শোনানোর জন্য আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি এবং সেই সুইস মহিলা দু'জনেই আমার বাড়িতে এসেছিলেন এবং আমার অর্কেস্ট্রা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আমি যে অর্কেস্ট্রা তৈরি করেছিলাম তার সবগুলি যন্ত্রই ছিল ভারতীয়। যেমন সেতার, সরোদ, বাঁশি, বেহালা, এসরাজ প্রভৃতি। উদয়শঙ্কর আমার সেই অর্কেস্ট্রা শোনার পর আমাকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর সংগৃহীত কিছু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ছিল এবং সেগুলো তাঁর পরিবারের লোকেরাই বাজাতেন কিন্তু সেগুলিকে একত্রে পরিচালনা করার কোনও লোক ছিল না। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি এই

অর্কেস্ট্রার পরিচালন ভার নিই। এইসময় তিনি কলকাতায় 'নিউ এম্পায়ারে' একটি শোয়ের আয়োজন করেন এবং এই অনুষ্ঠানের শেষ দুটি নাচ তিনি আমার তৈরি অর্কেস্ট্রা থেকে Composition করেছিলেন। এরপরেই তাঁর অনুরোধে আমি তাঁর অর্কেস্ট্রা পরিচালনার ভার নিই এবং তাঁর সঙ্গে বিদেশযাত্রা করি। এটিই আমার প্রথম বিদেশযাত্রা (১৯৩০)। প্রায় চার বছর আমি উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠান করেছি। এরপর কলকাতায় ফিরে নিজস্ব ট্রুপ তৈরি করি এবং সেই ট্রুপ নিয়ে আমি জাভা, বালি, সুমাত্রা প্রভৃতি জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়িয়েছি প্রায় দু'মাস ব্যাপী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ১৯৩০ সালে বিদেশে থাকাকালীন প্যারিসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় সংগীতগুণীদের নিয়ে একটি কলোনিয়র একজিবিশন হয়। এই অনুষ্ঠানে আমি বালি দেশের যন্ত্রসংগীত শুনে মুগ্ধ হই। পরবর্তীকালে এই যন্ত্রটির মোহেই আমি বালিযাত্রা করি। এরপর কলকাতা ফিরে আমি ১৯৩৪-এ 'নিউ থিয়েটার্সে' জয়েন করি। তৎকালীন নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি. এন. সরকারের সাহায্যে আমি জাভা, বালি, বার্মা প্রভৃতি দেশের বাদ্যযন্ত্র আহরণ করে এগুলি আমার অর্কেস্ট্রায় ব্যবহার করি। এই বাদ্যযন্ত্রগুলির একত্র নাম ছিল গ্যামেলন। আমি প্রথম বাঙালি, বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের (ইউরোপীয় নয়) প্রয়োগ করি ভারতীয় অর্কেস্ট্রাতে। বলা বাহুল্য, বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের এই প্রয়োগে আমি খুবই কৃতকার্য হয়েছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, যদিও আমি অর্কেস্ট্রাতে বিদেশি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছিলাম তা সত্ত্বেও ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যকে আমি কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ করিনি। এই সময় আমি কিছু ছায়াছবির সংগীত পরিচালনা করি। যেমন দেবদাস (হিন্দি), দত্তা, পূজারিণী প্রভৃতি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আমি নিউ থিয়েটার্সে ছিলাম। এরপর ১৯৩৯ সালেই আমি বোম্বে চলে যাই ফিল্মে সংগীত পরিচালনার কাজে এবং একটানা দশ বছর বোম্বেতে কাটাই। ১৯৪৯ সালে আমি করাচি চলে যাই ফিল্মের সংগীত

পরিচালনার কাজে এবং একটানা চার বছর সেখানে থাকি। করাচি যাওয়ার আগে আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে (ইন্দ্রনীল) মাইহারে রেখে যাই। করাচি থাকাকালীন সংগীত পরিচালনার কাজে এক বার ঢাকা যাই এবং তারপর আমি কলকাতা ফিরে আসি।

আমার সময়ে আমি যখন Concert তৈরি করেছি তখন আমি ভারতীয় সংগীতের ধারাকে পুরোপুরি প্রায় বজায় রেখেই করেছি, যদিও কিছু কিছু বিদেশি যন্ত্র (যেমন গ্যামেলন) আমি ব্যবহার করেছি। কিন্তু বর্তমানে যে-সব Composition হচ্ছে তাতে বিদেশি যন্ত্র ব্যবহারের আধিক্য অনেক বেশি এবং বিদেশি Pop সুরের প্রাধান্য অনেক বেশি। এগুলো লোকে নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হচ্ছে না। একটা উপমা দিই—যেমন আঙুরের তাজা রস খেতে খুব ভাল, কিন্তু রেখে দিলে পচে যায়। কিন্তু তার থেকে যদি (wine) মদ তৈরি হয়, তা হলে অনেকদিন থাকে। এখন যে সমস্ত Composition হচ্ছে তা একেবারে বিদেশি নকল। আমার মনে হয়, একে যদি দিশি ভাবে আনা যায় তা হলে সেটা থাকতে পারে। আমার মনে হয় একেবারে ভারতীয় সংগীত দিয়ে Concert তৈরি করা চাই, এবং এর অনেক রাস্তাও আছে। আজকের দিনে ইউরোপীয় সংগীতের মিশ্রণে যে জগাখিচুড়ি Composition, সেটা ঠিক কাম্য নয়। সত্যিকারের অর্কেস্ট্রা ভারতবর্ষে প্রায় নেই বলা চলে। আমি ছাড়া ভারতে আর কেউ অর্কেস্ট্রা তৈরি করেননি বলেই অনেকে আমাকে 'Father of Indian Orchestra' বলে থাকেন। আমার মতে ভারতীয় অর্কেস্ট্রাতে বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বেহালাকে পুরোপুরি এবং গিটারকে আংশিকভাবে স্থান দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে যাঁরা Composition করছেন, আমার মনে হয় তাঁদের আরও বেশি শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

ভারতে ভারতীয় অর্কেস্ট্রার ভবিষ্যৎ

আমি আশাবাদী। যদিও দেখছি জনসাধারণ অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন তবুও দৃঢ়বিশ্বাস রাখি অর্কেস্ট্রা লোকে গ্রহণ করবে। তেইশ বছর হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কালোবাজারে বহু লোকে অগাধ টাকার মালিক হয়েছে। যুদ্ধের আগে ইউরোপ আমেরিকা যাওয়া দুরূহ ও সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। স্বাধীনতা পাবার পর লোকের হাতে যে কাঁচা টাকা জমে ছিল সেগুলো কীভাবে খরচ করা যায় সেটা একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। তাই লোকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যাওয়া-আসা শুরু করে দিল যেন এপাড়া-ওপাড়া। বহু লোকে তাদের পুত্র-কন্যাদের পাঠালেন নানাদেশে বিদ্যা শিক্ষার জন্য। যারা ওসব দেশে গিয়েছিলেন অনেকেই সেই সবদেশের সাংস্কৃতিক দিকটাও দেখেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ হল সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রা ও কনসার্ট। এ ছাড়া থিয়েটার সিনেমা তো আছেই। তাঁরা দেখেছেন যে ওদেশে অর্কেস্ট্রা ও কনসার্ট সাংস্কৃতিক জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। ওদের দেশে এগুলি সভ্যতার মাপকাঠি। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী অন্তত সপ্তাহে এক দিন কোনও অর্কেস্ট্রা বা কনসার্ট তারা শুনতে যাবেই। ভারতীয়রাও ওদেশে কনসার্ট, অপেরা, থিয়েটার, অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করেছেন। এখানে আমি কেবলমাত্র সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধেই আলোচনা করতে

চাই এবং এর ভবিষ্যৎ আমাদের দেশে কতটা উজ্জ্বল সেই বিষয় আমার কী ধারণা সেইটাই বলতে চাই। সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রা মোটামুটি একই। সুতরাং আমি কেবলমাত্র অর্কেস্ট্রা বলেই উল্লেখ করছি।

ভারতে অর্কেস্ট্রা জনপ্রিয় হয়নি কেন এর কারণগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। লোকে গ্রহণ করছেন না কেন। অথচ একটা মজার জিনিস লক্ষ করা গেছে, বিশেষত বোম্বাই ফিল্ম সংগীতে। হঠাৎ বেজে উঠল একশো-দেড়শো যন্ত্রীর এমন এক অর্কেস্ট্রা যেটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের কোনও বিখ্যাত সংগীতস্রষ্টার কৃত। শুনে মনেই হয় না যে এটা কোনও ফিল্মি গানের ভূমিকা। যখন কান খাড়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকি আর ভাবি এই অর্কেস্ট্রা হঠাৎ বাজতে শুরু হল কেন। কিন্তু একটু পরেই যেন মহাকাশ থেকে ভূতলে পতন। কোনও একজন বিখ্যাত গায়ক বা গায়িকার গান। আওয়াজের ধার দিয়ে এতই বেখাপ্পা যে দন্ত কিড়িমিড়ি না করে পারি না। অমন একটা সুন্দর অর্কেস্ট্রার পর অনেক সময় গানের কথাগুলি মনে করিয়ে দেয় "পদি তুই ফুল বাগানে চ"। শুধু তাই নয় ওই মিনমিনে একক গান আর অন্তবর্তী যন্ত্রসংগীত সেইরকমই পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রার নকল। আশ্চর্য হই এইসব গানের শুরুতে মাঝে মাঝে যে অর্কেস্ট্রা বাজে জনসাধারণ সেটা তো গ্রহণ করেছেন। তবে শুধু অর্কেস্ট্রাই বা তাঁদের ভাল লাগে না কেন? আসল কারণ সেরকম চেষ্টাই হয়নি জনসাধারণকে অর্কেস্ট্রা শোনাবার। আকাশবাণীও অর্কেস্ট্রার বিশেষ কোনও মূল্য দেন না। স্বাধীনতার পূর্বে কলকাতার আকাশবাণী অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে বেশ উৎসাহিত ছিলেন, কিন্তু ১৯৪৭-এর পর সেই উৎসাহে একেবারেই ভাঁটা পড়ে গেছে। জনসাধারণকে অর্কেস্ট্রা না শোনালে তাঁরা এ-বিষয়ে উৎসাহবোধ করবেন কেন। ক্লাসিকাল সংগীত মুষ্টিমেয় কয়েকজন শৌখিন লোক ও রাজা-জমিদারদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর

যখন কনফারেন্সের সংখ্যা বাড়তে লাগল জনসাধারণও এ-বিষয়ে অভূতপূর্ব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে অর্কেস্ট্রাও যদি জনসাধারণকে ভাল করে শোনানো হয় তাঁরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্বে নৃত্যও তো অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। আসলে প্রচারের মাধ্যমেই লোকে গ্রহণ করে, তবে তার ভিতর সত্যিকারের বস্তু থাকা চাই। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে কয়েকশো বৎসর পুরাতন সংগীতের অর্কেস্ট্রা লোকে আজও আগ্রহভরে শুনতে যান তার কারণ সত্যকারের খাঁটি সোনার মতন নিশ্চয় কিছু আছে। আমাদের ক্লাসিকাল সংগীতও ঠিক সেই রকমই।

পুরাকালে আমাদের দেশে অর্কেস্ট্রা ছিল কি ছিল না এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। কিন্তু কোনও সাংস্কৃতিক শিল্পচর্চা ছিল না বলেই সেটা আর হতে নেই, এরকম মাথার দিব্যি মুনি ঋষিরা তো কেউ দিয়ে যাননি।

অর্কেস্ট্রা শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে একেবারেই নেই। ভারতীয় সংগীত দ্বারা অর্কেস্ট্রা হতে পারে এরকম ধারণাই লোকে পোষণ করেন না। এক সময় ছিল যখন ঐক্যতান বাদন হত। কিন্তু সেটাকে অর্কেস্ট্রা পর্যায়ে ফেলা চলে না। আমরা তখন স্কুলে পড়তাম। তখন শব্দহীন সিনেমার যুগ। সেই সময় থিয়েটারে বা সিনেমায় শুরুতে ও বিশ্রামের সময় ঐক্যতান বাদনের রেয়াজ ছিল। তালবাদ্যগুলি (percussions) বাদে অন্য সমস্ত যন্ত্রেই একসঙ্গে একটি গৎ বাজানো হত। সেইসব গৎ কিন্তু আজকাল শুনতে পাওয়া যায় না। সেগুলি যদিও খুব উচ্চ পর্যায়ের নয় কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক অপেশাদার ক্লাব ছিল সেখানেও এই সব গৎ বাজানো হত। আমি নিজেও এইরকম দু'-একটা ক্লাবে ক্লারিওনেট বাজাতুম। একটা বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, একমাত্র তালবাদ্যগুলি ছাড়া বাকি সব যন্ত্র ছিল বিদেশি। এগুলিকে তখন কনসার্ট পার্টি বলা হত। কিন্তু যে

সময় থেকে সবাক চিত্রের আবির্ভাব হল, আস্তে আস্তে সিনেমা হলগুলিতে কনসার্ট পার্টিরও দিন ফুরিয়ে আসতে লাগল। যদিও থিয়েটারগুলিতে আরও কিছুদিন কনসার্ট প্রথা চালু ছিল। এখন কিন্তু এ-জিনিস একেবারেই শোনা যায় না। এই কনসার্ট কিন্তু বৎসরে এক বার মাত্র দেখতে ও শুনতে পাওয়া যায় যখন পরেশনাথের শোভাযাত্রা বেরোয়। একটা প্রকাণ্ড লম্বা গাড়িতে এই কনসার্ট পার্টি শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকত। এই ধরনের কনসার্ট পার্টি যে আজও বেঁচে আছে ভাবতেই অবাক লাগে।

কোনও কিছুরই ভবিষ্যৎ আপনা-আপনি গড়ে ওঠে না। তাকে গড়ে তুলতে হয় আন্তরিক চেষ্টায় ও কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা। অর্কেস্ট্রাতে জনসাধারণের মনে আগ্রহ সঞ্চার করতে হলে দরকার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম। কিন্তু কেবলমাত্র চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারাই অর্কেস্ট্রার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে না। যার যা ক্ষমতা আছে তাঁকে সেটি প্রয়োগ করতে হবে। বাড়ির খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আজকালকার দিনে সম্ভব নয়। সে একসময় ছিল তিন দশকেরও পূর্বে যখন কুড়ি-পঁচিশজন যন্ত্রী সপ্তাহে দু'দিন এক জায়গায় আগ্রহের সঙ্গে সমবেত হতেন, অর্কেস্ট্রায় অংশগ্রহণ করবার জন্য। আজকালকার দিনে সেটা অসম্ভব। এমনকী কাহাকেও অনুরোধ করাও যায় না। সে যুগ বদলে গেছে। এখন শৌখিন গাইয়ে বাজিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপায় নেই, এই দুর্দিনে সাধারণভাবে বেঁচে থাকবার তাগিদটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে আমাদের দেশে নানা রকমের সংগীত আছে। অর্কেস্ট্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কী? অর্কেস্ট্রা আমাদের দেশে ছিল কি না সেটা তো কারওর জানা নেই। আর ভবিষ্যতে যদি অর্কেস্ট্রা গড়ে ওঠে তাতে লাভ কী? কতকগুলি যন্ত্র যন্ত্রীরা একসঙ্গে বাজাবেন, এতে ভারতীয় সংগীতে কতটা উৎকর্ষতা বাড়বে? সিনেমায় গানের মধ্যে মধ্যে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে আমরা তো বহু বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে

শুনে থাকি, সুতরাং অর্কেস্ট্রাতে আর নতুন কী রস সৃষ্টি হবে? এইসব প্রশ্ন করবার মতন লোক অনেক আছেন। ফিল্ম গান পছন্দ করেন নব্বই শতাংশেরও বেশি। অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই নেই এই ধরনের ব্যক্তি বহু আছেন। আরও অনেকে আছেন যাঁরা অর্কেস্ট্রাকে ঐক্যতান বাদন বলেই জানেন। আকাশবাণী নাম দিয়েছেন 'বাদ্যবৃন্দ'। কিন্তু এই শব্দটাতেও অর্কেস্ট্রার ব্যাখ্যা হয় না। Symphony Orchestra-র বাংলা বা সংস্কৃতে প্রতিশব্দ পাইনি।

আজকাল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। তাঁদের শুভেচ্ছা থাকলেও এটা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। ভারতের বাইরে থেকে কোনও বিখ্যাত অর্কেস্ট্রা দল এলে এঁরা টিকিট কিনে হাউস ফুল করে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কেবলমাত্র অর্কেস্ট্রার দ্বারা লোকরঞ্জন করা শুধুমাত্র কলকাতাই নয় সারা ভারতে একরকম চেষ্টাই করা হয়নি। আমাদের পূর্বপুরুষরা অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করেননি বলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার বা মূল্য দেবে না এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না। আসল কথা অর্কেস্ট্রা সংগীতের আসল রূপটি জনসমক্ষে ঠিকভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। গ্রামোফোন রেকর্ডে আমরা সারা ভারতের কত রকমের সংগীত শুনে থাকি কিন্তু অর্কেস্ট্রা সংগীত একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। আমাদের রাগসংগীত যেমন সীমার মাঝে অসীম এবং শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতা থাকে রাগভ্রষ্ট না হয়ে অবাধে বিস্তার করা যায়, অর্কেস্ট্রায় কিন্তু সেরকম সুযোগ বা সুবিধা নেই। যদিও একটা অর্কেস্ট্রা দলে একশতর ওপর যন্ত্রী থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যা বাজাচ্ছেন সেটা একজন শিল্পীর একটি সৃষ্টি। এ-স্থলে স্রষ্টা শিল্পীর যা নির্দেশ দেওয়া আছে বাজাবার জন্য সেটা মেনে চলতেই হবে। একশত যন্ত্রীর অর্কেস্ট্রাতে প্রধান ভূমিকায় থাকেন conductor অর্থাৎ পরিচালক। ইনিই হচ্ছেন অর্কেস্ট্রার প্রাণ। শ্রোতাদের মন, প্রাণ, চোখ, কান পরিচালকের ওপর

নিবদ্ধ থাকে। কেবলমাত্র হাত নেড়ে অর্কেস্ট্রার অতগুলি যন্ত্রী দ্বারা তাল-লয়ে বাজানোই পরিচালকের প্রধান কাজ নয়। পরিচালকের হস্তচালনার ওপর অর্কেস্ট্রা সংগীতের ভাবমূর্তি মূর্ত হয়ে ওঠে। ওই দুটি হাতের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে তাল-লয়কে কন্ট্রোল (control) করা। বহুসংখ্যক যন্ত্রী একত্রে পরিচালকহীন হয়ে অর্কেস্ট্রার যে-কোনও অংশ তাল-লয় বজায় রেখে বাজানো অসম্ভব। সমস্ত যন্ত্রীর দৃষ্টি থাকে পরিচালকের ওপর। তিনি যন্ত্রীদের দিকে মুখ করে থাকেন সুতরাং জনসাধারণের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ছাড়া উপায় নেই। দ্বিতীয় সংগীতের ভাবমূর্তি, সুরের ওঠা-নামা, নানাপ্রকার ঘটনাচক্র ও অলংকার দ্বারা বর্ণনা, এ সমস্তই পরিচালকের হস্তচালনা, মুখের ভাব, চোখের চাহনি এবং সামান্য সারা অঙ্গের মৃদু সঞ্চালন আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। একমাত্র যন্ত্রীরাই পরিচালকের সংগীত প্রকাশের এই ভঙ্গিকেই যন্ত্রে রূপ দিতে চেষ্টা করেন। শ্রোতারা পরিচালকের পরিচালনা সামনে থেকে দেখতে পান না কিন্তু দুই হস্তের দ্বারা সুর, লয়, তাল ইত্যাদির প্রকাশভঙ্গি উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য অর্কেস্ট্রা সংগীতের আসল রূপটা শ্রোতাদের কানের মধ্য দিয়ে মরমে প্রবেশ করানো। জনসাধারণ যদি চেষ্টা করেন তা হলে অর্কেস্ট্রার রূপ, রস, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। তবে এ সমস্তই অনুভূতি সাপেক্ষ।

অগ্রন্থিত